দ্বিতীয় বর্ষের

শারদীয়া

জেলার খবর সমীক্ষা

আশ্বিন ১৪১৫ অক্টোবর ২০০৮

"শিক্ষা আনে চেতনা"

সম্পাদকীয়

বর্তমান পূজার অবস্থা

হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পার্বনের মধ্যে শারদ্যোৎসব একটা। আর এই শারদ্যোৎসবে মা আসছেন। মাকে বরণ করে নেবার জন্য আমরা বাঙালীরা তৈরি হচ্ছি বেশ কিছু দিন ধরেই। অবশ্যই মা আর বাঙালিদের মধ্যে সীমবদ্ধ নেই এখন প্রায় সর্বধর্মের মানুষের হয়ে গেছে। এই মা এর আসা নিয়ে তৈরি হয় একটা মিলনক্ষেত্র বা মিলন মেলা। মা-এর আসাকে কেন্দ্র করেই আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের ঘর গোছানো, নতুন কিছু করা, নতুন ভাবে সাজা ও সাজানো।

এই শারদ্যোৎসব উপলক্ষে কত মানুষ আজ রুজি রোজগার জেগাড় করছে তার হিসাব নেই।

আগে পূজা করত জমিদার ও বিত্তশালী ব্যাক্তিরা। এখন যুগ পাল্টেছে, পূজা চলে এসেছে বারোয়ারীতে। এই বারোয়ারী পূজার প্রচলন অনেক হযেছে। শহরের পূজাগুলো হয় বিশাল টাকা খরচ করে। তাদের মধ্যে আবার বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। কিন্তু গ্রামের জমিদার আমলে পূজা ভাল হলেও বর্তমানে সেই জমিদারী না থাকার ফলে পূজা হয় ঠিকই কিন্তু কোন রকমে না করলে নয় এরকম অবস্থায় প্রায়। আর যেসব বারোয়ারীগুলো তৈরি হয়েছে তাদের অবস্থাও প্রায় একই রকম। যেহেতু গ্রামের মানুষের হাতে টাকার পরিমান কম। আবার যদি তার উপর বন্যা হয়ে যায় তবে তো আর দেখতেই নেই গোটা পূজাটা গেল ভেস্তে।

এত কিছু উত্থান পত্তনের মধ্য দিয়ে বেড়ে চলেছে বারোয়ারী পূজার সংখ্যা।

তবে বর্তমানে পূজার সংখ্যা বেড়ে গেলেও এখন ভক্তি ভরে পূজার চেয়ে ঘড় সাজানোর চিন্তায় মত্ত প্রায় সকল পরিচালক মন্ডলী।

দ্বিতীয় বর্ষের

শারদীয়া

জেলার খবর সমীক্ষা

আশ্বিন ১৪১৫ অক্টোবর ২০০৮

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় - ১

প্রবন্ধ

১। শারদীয়া উৎসব প্রত্যাক্ষ ও প্রাত্যাশা
কাবেরী কাঁড়ার - ২

২। একটি গাছ একটি প্রাণ
মনিরুল ইসলাম - ১৩

৩। গ্রামের পূজা
রুপচাঁদ রায় - ২২

রম্য রচনা

১। মা আসছেন
- ৪

ধর্ম

১। জননী ও দেবী সারদা
বিনয় শংকর চক্রবর্ত্তী - ১১

২। আদ্যাশক্তি মহামায়া
বঙ্কিম পন্ডিত - ১৫

৩। দূর্গা প্রতিমার আবির্ভাব - ৬

ভ্রমন

১। গহন অরন্য আর নীল নদ
স্বর্গীয় কল্যান ঘোষ - ৮

২। মন্দারমনি
গোবিন্দ লাল বন্দ্যোপাধ্যায় - ৯

গল্প

১। বুম্বা
উত্তম কুমার পাল - ৭

২। দুই দৈত্যের গল্প
অমিত কুমার রায় - ১৯

সংবাদপত্রের সাংবাদিক চাই

ক্যাটাগরি-এ ঃ

যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চান এবং স্বেচ্ছাশ্রমে সংবাদপত্রের মাধ্যমে এলাকার মানুষের সেবায় আগ্রহী ইচ্ছুক সরকারী/ বেসরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের কাছে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্যাটাগরি-বি ঃ

পার্টটাইম সাংবাদিকতা ঃ যারা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত আছেন (পুরুষ/মহিলা) অথবা যে সকল মহিলা নিজের গৃহস্থালীর কাজের মধ্যেও সময় করে আগ্রহী তারা পার্টটাইম ভিত্তিতে সাংবাদিকতায় আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন।

ক্যাটাগরি-সি ঃ

শিক্ষানবীশ সাংবাদিক ঃ যে সকল আগ্রহী তরুন/তরুনীরা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সাংবাদিক হতে চান এবং নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা গ্যাজুয়েট / আন্ডার গ্যাজুয়েট তারা শিক্ষানবীশ সাংবাদিক পদের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। শিক্ষান্তে শিক্ষা সার্টিপিকেট।

বিঃ দ্রঃ - সমস্ত ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে ফটো, বায়োডাটা সহ দরখাস্ত পাঠান। আবেদন পাঠাবার ঠিকানা ঃ

জেলার খবর সমীক্ষা

প্রযত্নে ঃ শিবনাথ চক্রবর্ত্তী
গ্রাম ও পোঃ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
মেহেবুব হোসেন ঃ (০৩২১৪)২৩৪-৩৭৫

নিউ বাণী প্রেস কোম্পানী-এর পক্ষে
শিবনাথ চক্রবর্ত্তী (৯৮০০২৮৬১৪৮) কর্তৃক সম্প্রাদিত,
প্রকাশিত এবং মুদ্রিত।
সংযুক্ত সম্পাদক মেহবুব হোসেন
(০৩২১৪-২৩৪-৩৭৫), বিলাস দলুই,
বক্তিয়ার রহমান (৯৭৩৩৭০৩৭২৫)।
প্রচ্ছদ ঃ গুলজার হোসেন
যোগাযোগ - অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া-৭১১ ৪০১ ;
email : jelarkhabar@rediff.co.in

৩। 'সু..'
তরুন সাধুখাঁ - ৫

স্বাস্থ্য

১। পেটের রোগ ও হোমিওচিকিৎসা
ডাঃ দেবাশিষ মালিক - ১৭
২। মরনোত্তর চক্ষুদান - ১৮

কবিতা

১। আগমনীর বার্তা
সন্তোষ হালদার - ৩
২। স্ফুলিংগ
পলাশ ব্যানার্জী - ৩
৩। শব্দের পাঁচিল
রবীন চট্টোপাধ্যায় - ৩
৪। অতল
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র - ৩
৫। ঘুমিয়ে যখন তোমরা
অভিজিৎ হাজরা - ৫
৬। ছন্দে রামায়ন
অসিত কুমার গঙ্গোপাধ্যায় - ১২
৭। ঘড়ি
মুকুল চ্যাটার্জী - ১০
৮। বার্থ ডে গিফট
শক্তিপদ ভট্টাচার্য্য - ১০
৯। সুকান্ত প্রাঙ্গনে
প্রনব ভট্টাচার্য্য - ১৩
১০। নর্মদার প্রপাত উজানে
নিমাই মান্না -
১১। পড়া ও খেলা
সুজিৎ সাঁতরা - ৫
১২। স্বাধীনতা
সেখ বক্তিয়ার রহমান - ১৪
১৩। দুটি কবিতা
প্রনয় সরকার - ৩

গান

১। গৌরচন্দ্রিকা
আবদুল গফুর খাঁ - ২২

পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত
মডার্ন
কম্পিউটার সেন্টার
ল্যামিনেশন এন্ড জেরক্স
কম খরচে অধিক ক্লাস ও অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা কম্পিউটার প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।
বিঃদ্রঃ স্পোকেন ইংলিশ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
প্রোঃ বিমল দোলুই
ফোন ঃ ৯৪৩৩৭০৬৩৮৯
জয়পুর মোড় (থানার নিকট), হাওড়া।

আপনাদেব পরিসেবায় নিয়জিত IRDA অনুমদিত
সেখ বক্তিয়ার রহমান
BAJAJ ALLIANZ
S.B.I.
LIFE INSURANCE CO. LTD.
সর্বৎকৃ,ট পলিসির মাধ্যমে আপনার সঞ্চিত অর্থের বৃদ্ধিঘটান, ভবিষৎ সুরক্ষিত রাখুন ও সর্বাধিক নিরাপত্তাপান।
যোগাযোগ ঃ
রহমান বুক স্টোর্স, ঝিখিরা
মোবাইল ঃ ৯৭৩৩৭০৩৭২৫

শারদীয়া উৎসব
প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যাশা

কাবেরী কাঁড়ার

উৎসব কথার অর্থ হল আনন্দানুষ্ঠান। সামাজিক মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে প্রায় নির্দিষ্ট কর্মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। যাতে থাকে তার জীবন জীবিকার প্রশ্ন। এই শৃঙ্খলবদ্ধ জীবন থেকে আসে তার এক ঘেয়েমিকতা, এই একঘেয়েমিকতা থেকে মুক্তিপেতে এবং নতুন করে প্রাণের প্রেরণা সঞ্চয় করতে এবং একের সঙ্গে বহু প্রাণের সাক্ষাত ঘটাতে প্রয়োজন হয় উৎসবের। শারদীয়া উৎসব একটা ধর্মীয় উৎসব বা ধর্মকে কেন্দ্র করে মানুষের মিলন উৎসব। কিন্তু এই আধুনিক উৎসবের আঙ্গিনায় এসেছে আধুনিক সময়ের ছোঁয়া। এসেছে পন্য সংস্কৃতি, এসেছে প্রতিযোগিতা। কিন্তু উৎসবের ক্ষেত্রে এগুলি আকাঙ্খিত নয়। প্রতিযোগিতা তখনই সুন্দর থাকে যখন তা শুধুমাত্র বিকাশে সহযোগিতা করে। প্রতিযোগীর মধ্যে মানসিকতা থাকতে হবে তার চেয়ে পিছিয়ে পরা মানুষদের সমপর্যায়ে তুলে আনা আর তার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের মত সমপর্যায়ে উন্নতি হওয়া। কিন্তু উৎসবের প্রতিযোগীতার মধ্যে সেই মনভাব থাকে কি? তাহলে উৎসবের মাঝে সকলের নির্মল আনন্দের মানসিকতা বজায় থাকে কিভাবে? বিজয়ী ও বিজিত উভয়ে একই ভাবে উৎসবকে অনুভব করবে কিভাবে? প্রতিযোগীতার মাধ্যমে সত্যিকারের মিলনের সুর প্রতিফলিত হয়? এই প্রতিযোগীতা না করে উৎসবকে আধুনিক মিলন ক্ষেত্র করাটাই আকাঙ্খিত। বর্তমানে এই উৎসব করতে ব্যায় করা হচ্ছে প্রচুর অর্থ। এই অর্থ সংগ্রহের প্রত্যেকটা পথ কি সঠিক? তা যদি না হয় তাহলে উৎসবের উদ্দেশ্য বজায় থাকে কিভাবে? সমাজের মঙ্গল আসবে এই পথে? এই বিপুল অর্থ খরচের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে কি? এই পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে যে প্রাকৃতিক পরিবেশে, উৎসব সংগঠক মানুষ সেই পরিবেশের কথা ভাবছে কি? পরিবেশকে নিয়ে ভাবার প্রয়োজন ছিল এবং আছে। উৎসবের ফলেই কতটা দূষন আসছে সেটা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

এত জাঁকজমক, জৌলুস ছেড়েও উৎসব করা যেতে পারে। উৎসবের আনন্দ আনতে জৌলুসের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় আন্তরিকতা, সচেতনতা, বিচক্ষনতা প্রভৃতি মানবিক গুনগুলোর। যেগুলো মানুষকে করবে মানুষের প্রতি দরদী, মানুষকে করবে পরিবেশ বান্ধব। তার চিন্তাধারাকে বিকশিত করবে, মানুষ সুস্থ চিন্তাশীল হবে।

উৎসব হবে একান্ত ভাবে মানুষের মিলনক্ষেত্র, মানুষ আপন প্রাণেব

এরপর ১২র পাতায়

আগমনীর প্রার্থনা

সন্তোষ হালদার

মায়ের পদস্পর্শে হবে
ধন্য ধরা ধাম,
নতুন করে তাইতো বাঁধি
আগমনী গান।
সেই গানেতে মাথা দোলায়
পাশ মাকা মাথা কাশ
অশান্ত এ ধরার বুকে,
শান্তির আশ্বাস।
শান্তি এখন জলধরে
মাঠভরা সবুজ ধানে,
সোনা রোদে শীউলি ঝরে
নতুন আশা মনে প্রাণে।
নতুন জামা নতুন কাপড়
বিলেয় দেদার দামে,
নতুন লেখা নতুন কাগজ
ক্যাসেট নতুন গানে।
তোমার কাছে প্রার্থনা মা
সবই যখন নতুন
দাওমা একটু নতুন আলো
দাওনা একটু মাতন।
সেই মাতনে মাতুক সবাই
নাচুক মহাপ্রান
অনাচারের পতন করে
ফিরাও সুরোধাম।

দুটি কবিতা

প্রণয় সরকার

শুধু একবার .....

একবার চেয়ে দেখ সূর্যটাকে, এনে দেব।
একবার বলে দেখ, সাগরে পাড়ি দেব।
একবার কেঁদে দেখ সব জল মুছে দেবে।
একবার হেসে দেখ - সব দাঁত ফেলে দেব।

বন্ধু

বন্ধু মানে খেলার সাথী
বন্ধু মানে রাগ।
বন্দু মানে দুঃখ সুখের সমান সমান ভাগ।
বন্ধু মানে সুখে হাসি, দুঃখে চোখের জল
বন্ধু মানে হঠাৎ মেসেজ কিংবা মিসকল।

শব্দের পাঁচিলে

রবীন চট্টোপাধ্যায়

অনুবিক্ষণে তাকিয়ে দেখ
অনুভূতি প্রবন শব্দেরা
কেমন অসহায়, ক্ষণভঙ্গুর

এ শব্দ তো শব্দ বাজী নয়
এ শব্দ শুধুই আত্মিক
যেন রাজমিস্ত্রির হাতে গড়া
সে বৃহৎ ইমারত।

এখন! মানব মানবী হতে
লোভ লালসার পাঁচিল ভেঙে
মিথ্যের খোলস ছেড়ে
সব্বাই এসো; বেরিয়ে পড়ি
সমান্তরাল মুক্ত বিচরণ ভূমিতে।

'যা কিছু প্রাচুর্য, জমানো সম্পদ
যা কিছু বিনিময় পশুর প্রবৃত্তিকে
সাজিয়ে রাখে,

মুক্ত পৃথিবীর সাজানো বাগানে
সেই সব স্বরাতোক্তির প্রয়োজন নেই
প্রয়োজন আসল মানুষ ও মননের সংস্কার।

অতল

চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

কালো চোখে খেলে যায়
সাগরের নীল জল
যতই ডুব দিই
মেলে না তো শেষতল।
কঠীনে বন্দী রেখেছো
কোমল মনটা
বাইরে প্রবন্ত মেঘ
সেজে ওঠে যেমনটা।
হারালে খুঁজে পাই
অচেনা না যেতে
চেনা নামে ডাকলে
ভোঙকা ও ভুনেতে।

স্ফুলিঙ্গ

পলাশ ব্যানার্জী

বড়ো পাপ বাবু হে, তোমরা বড় পাপী,
পাপে ভরে দিলেক হে সব খান।
বোঙার তৈরী পৃথিবীতে
মানুষ ছিল কত সুখী।
বন ছিল, ছিল ঝর্না, পাহাড়, গাছ
ছিল পাখী, ফুল, ফল আর মানুষ।
সব তোমরা ছিনায়ে নিলে -
আমাদের সুখ, আনন্দ, ভালোবাসা
সব কিছু, ছিনায়ে নিলে আমাদের
মেয়েদের মা'য়ে দেরও।
বাবু হে বড়ো পাপী তোমরা।
আমাদের জোয়ান ছেলেগুলান, মেয়েগুলান
পাপে ডুবে গেলো - তোমরা শিখালে সব।
আকাশে গাছ আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা
তোমাদের জন্য, লতা আর ফুল ফোটায়না
তোমাদের জন্য - নদী আর জোছনা মেখে
লাচেনা - বাবু হে তোমরা বর পাপী।
আমরা চাঁদের আলোয় মহুয়া খেয়ে
মাদল বাজিয়ে লাচি পাপ করিনা।
তোমরা বিলাতী রস খেয়ে লাচো
পরের ঘরনীকে লষ্ট করার জন্য।
বাবু হে তোমরা আমাদের অনেক লিয়েচ
- রক্ত, ঘাম, কান্না, ইজ্জত - ইসব
আর হবেক নাই।
বাবু হে দেখ ই শাল সাগোয়ান
সিধা সোন্দর আমাদেরই মত
তোরা এদের শেষ করেছিস
করবি আমাদেরও।
না আমরা গাছলই, মানুষ
শেষ হবনা।
আমাদের বুকের মাঝে ধিমা ধিমা
আগুন জ্বলছে চোখে লাগছে লতুন
দিনের আলো, হাত গুলান
শক্ত হইছে বদলা লিবার তরে।
তোমাদের আমাদের সব পাপকে
ধ্বংস করে দিব - আগুন
জ্বালায়ে সব পুড়ায়ে দিব
ছাইয়ের গাদা থেকে আবার
বর্ষার জল পেয়ে মাথা তুলবে
শাল, সাগোয়ান, কুর্চি, শিমুল
বাবু হে এত পাপ সইব না।

মা আসছেন

প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য

এখন সারা পৃথিবীতে তথা বিশেষ করে ভারতবর্ষে, তার থেকেও পশ্চিমবঙ্গের আকাশে বাতাসে বেজে উঠেছে মায়ের আগমন বার্তা। একদিন স্বর্গে বসে মা দূর্গাকে কৈলাশপতি বললেন তোমারতো ছেলে পুলে পাড়া প্রতিবেশী চ্যালা চামুন্ডা নিয়ে মর্তে যাত্রার সময়তো ঘনিয়ে এল। চল আমি তোমার সঙ্গে কৈলাস পর্বত পর্যন্ত গিয়ে কৈলাশে অবস্থান করব। দশমীর দিন তুমি সপরিবারে ফিরে এখানে চলে আসবে। এখান থেকে আমরা স্বর্গে ফিরে যাব। নারদ মহাদেবকে বলে উঠলেন কিন্তু মা যে মন খারাপ করে বসে আছে বলছে এবার যেতে মন চাইছে না। কেন? কেন? বলে কৈলাসপতি লাফিয়ে উঠলেন।

নারদ বলে উঠলেন প্রভু আপনি তো এই কলিকালকে ভুলে থাকার জন্য সারাক্ষন দমদিয়ে পড়ে আছেন কি করে বুঝবেন আমাদের মায়ের দুঃখটা?

হাঁ হাঁ করে উঠলেন কৈলাশপতি মহাদেব। বললেন না না এটা ঠিক নয়, বল তোমার অসুবিধা আমি সমাধান করে দেব।

মা দূর্গা বলে উঠলেন জীবনেও পারবেনা। যত কিছুই তুমি সমাধান করনা কেন, এসবের মধ্যে আমার পুরো পরিবার জড়িয়ে আছে। ফলে অশান্তি দুর করার সাধ্য তোমার নেই।

- আচ্ছা তুমি বলই না দেখি, পারি কিনা সমাধান করতে।

শোনো তবে, দেখ সারা পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে লক্ষী সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা করে রেখেছে। চাষীরা চাষ আবাদ করে সারা দেশের অন্নের যোগান দিচ্ছে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে সবাই মানে গনেশ কিছু কিছু যায়গায় শপিংমল, বড় বড় হোটেল, বড় বড় ব্যবসা গড়ে তুলতে চলেছে। জমি না পেয়ে চাষের জমির দিকে হাত বাড়িয়েছে। ফলে আমার লক্ষীমন্ত মেয়ে মা লক্ষীর সঙ্গে গনেশ আর কার্ত্তিকের অশান্তি শুরু হয়ে গেছে। গনেশ গত কয়েক দিন শুধু লাড্ডু খেয়ে কাটিয়েছে। লক্ষী বলছে চাষের জমিতে ব্যাওসা বসিয়েছ। চাল পাবে কোথায়? আলু, শাক সব্জি তো আর ফলন হচ্ছে না, খাবি কি করে? লাড্ডু খেয়েই থাক্। কৈলাসপতি বলে উঠলেন গনেশের ব্যাপারটাতো বুঝলাম। তা কার্ত্তিক আবার কি ঘটাল?

- আরে বাবা কার্ত্তিক বিশ্বকর্মার সঙ্গে গোপনে চুক্তি করে ছোট ছোট খেলনা গাড়ি বানাবার জন্য অনেক চাষের জমি দখল করে চাষীদের পথে বসিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। আমি কিছুই সামলাতে পারছিনা। দেখ তুমি যদি পার। বলে মা দূর্গা ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

মহাদের চিন্তায় পড়ে গেলেন। এই সময় নারদ একতার নিয়ে গেয়ে উঠল -

যাও, যাও গিরি পাঠাতে গৌরী
প্রতিপদ এসে পড়ল যে।

মহাদেব আর কী করেন। গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন। চিন্তা করলেন সবাই তো আমার ছেলে মেয়ে। সবাইতো চাইছে খেয়ে পরে বাঁচতে। চাষ বাস না করলে মানুষ খাবে কি? আবার ইন্ড্রাষ্ট্রি না করলে মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়বে। এসবও তো প্রয়োজন। কার্ত্তিক গনেশ বিশ্বকর্মাকে নিয়ে বড় বড় কলকারখানা তৈরী করলে হাজার হাজার ছেলেমেয়ের উপকার হবে। আর সেই সঙ্গে মায়ের পূজোও বেড়ে যাবে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মহাদেব, তাই দেখে নন্দী আর ভৃঙ্গি গ্যাঁজার দম দিতেও ভুলে গেল।

এদিকে লক্ষীতো রেগে মেগে সেই যে লক্ষীর টাটে গিয়ে প্যাঁচাকে সঙ্গে নিয়ে বসেছে, বলেছে যতক্ষন না সমাধান হয় ততক্ষন আমি আমার টাট থেকে উঠব না। পূজোতেও যাব না। এদিকে কার্ত্তিক আর গনেশ দিদি দিদি যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর বাড়া বাড়ি করিস না। আমরা এবার ভেবে চিন্তে অনাবাদী জমি খুঁজে তাতে কলকারখানা বানাব। তুই উঠে পড়। মর্তে যেতে হবে যে। পূজো এসে পড়েছে। সবাই উতলা হয়ে উঠেছে তুই তোর টাট থেকে দয়া করে উঠে আয়। পূজোর পরই তো সাজ সাজ রব পড়ে যাবে। নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়বে। এই সময় এই ডামাডোল গন্ডোগোল হলে পাবলিকরা আর আমাদের ভোট দেবে না। দয়া করে একটু ফলের রসে চুমুক দিয়ে তুই তোর ব্রত ভঙ্গ কর। যা বলবি করব। তবে যেটা হয়ে গেছে সেটা ছেড়ে দে লক্ষী দিদি আমার।

কিন্তু ভবী ভোলবার নয় যে। তুই আমাকে বোকা ঠাউরে ছিস। ভোটের আগে কোনও কম্প্রমাইজ নয়। কম্প্রোমাইজ করলেই মানে ব্রতভঙ্গ করলেই যে ইলেকশনের পরাজয় অনিবার্য্য।

যাই হোক মহাদেব মোটামুটি সবাইকে রাজি করিয়ে পূজোয় মর্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। মর্তে নেমে কার্তিক আর গনেশ ছুটলো আই ফোন কিনতে। সঙ্গে তো আর পাওয়া যায় না? সরস্বতী ছুটল ল্যাপটপ কিনতে। আর লক্ষী ছুটলো সিঙ্গুর। সিঙ্গুরে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে বসে একটা সমাধানের রাস্তা খুঁজতে। যা হোক ভালয় ভালয় পূজোর চারদিন কাটিয়ে মহাদেবকে ফোন করল মা দূর্গা, আমরা ফিরছি, মহাদেব।

মহাদেব ফোনে জানাল - তোমরা কৈলাস পর্বতে আর নেমো না, কারন সে কৈলাস আর নেই। দূষন এত বেশী বেড়ে গেছে, ফলে আমার সাধের কৈলাশ আর নেই, বরফ গলে গিয়ে কৈলাশ ধ্বংস হবার পথে, তোমরা খুঁজে পাবে না।

আমি সঙ্গে ফিরছি। তোমরাও ফিরে এস সব কথা হবে, রাখছি।

ঘুমিয়ে যখন তোমরা

অভিজিৎ হাজরা

বছর পরে এলেন দেবী বাপের বাড়ী হেসে,
দীর্ঘ পথের ধকল স'য়ে তন্দ্রা এলো শেষে।
হঠাৎ রাতে তন্দ্রা কাটে চোখটি খুলে যেই,
পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন নেই যে অসুর নেই।
চোখ ফিরিয়ে ঘুরতে এপাশ চক্ষু হোলো স্থির,
কার্ত্তিক নেই - গনেশও নেই উধাও দু'জন বীর।
ও পাশেতে তাকিয়ে মায়ের দু'চোখ জলে ভরে,
লক্ষী এবং সরস্বতী নিখোঁজ কিসের তরে!
একটু পরেই সকাল হলে উপায় হবে কি যে,
ভাবেন শুধু কেমন করে এমুখ দেখান নিজে।
হঠাৎ দেবী তাকিয়ে দেখেন দাঁড়িয়ে অসুর দূরে,
গুনগুনিয় গাইছে কি সব নানান আজব সুরে।
বলেন দেবী সত্যি করেই ফেলব মেরে আজ,
পালিয়ে কোথায় গিয়েছিলি বলরে ধূর্তরাজ।
অসুর বলে মুচকি হেসে যাইনি আমি দূরে,
ভি.সি.আর. মা দেখে এলাম পাশের বাড়ী ঘুরে।
কৈলাসেতে নেইকো মাগো এমন ভিসি.আর.,
রঙিন ছবির জ্যান্ত সবই নেইকো জবাব তার।
মা তো অবাক শুনেই এসব বলেন তিনি আহারে,
একটি কিনে নিয়ে যাব কৈলাশের ঐ পাহাড়ে।
বলব গিয়ে শিবকে আমি গর্ব আমার দেশ,
হয় না কো আর মর্ত্তে এখন দূষন পরিবেশ।
এমন সময় হঠাৎ দু'বোন লক্ষী সরস্বতী,
হাজির হয়ে বলল মাকে সর্বগুনবতী।
মাগো তুমি অবুঝ হয়ে রাগ কোরোনা আর,
আমরা দু'বোন গিয়েছিলাম বিউটি পার্লার।
এই দেখনা মাগো তুমি - কেটে এলাম চুল,
বলছি কারন এ-কাজ করে হয়নি কোনো ভুল।
তেলের খরচ কমবে অনেক লাগবে নাকো ফিতা,
তুমিও যেও পার্লারে মা, হবেন খুশি পিতা।
গর্বে মায়ের বুকটা ভরে মেয়ের কথা শুনে,
দেশের মানুষ মিতব্যায়ী নয়তো অলুক্ষুনে।
বলেন তিনি আমিও যাব নিস্‌রে তোদের সঙ্গে,
লম্বা চুলে থাকবে না আর হাসবে সবাই বঙ্গে।
মায়ের কথা শেষ না হতে হঠাৎ হাজির এসে,
গনেশ এবং কার্ত্তিকরা বলল মাকে হেসে।
রাগ কোরোনা মাগো তুমি আমরা অবুঝ ছেলে,
গিয়ে ছিলাম কলকাতাতে চড়তে পাতাল রেলে।
স্বর্গ থেকে মর্ত্তে এলি কোথায় পেলি পাতাল,
বলেন দেবী কি গিলেরে হঠাৎ হ'লি মাতাল?
সত্যি কথা বলছি মাগো মিথ্যে সেতো নয়,
কলকাতাতে পাতাল দিয়ে রেলগাড়ী যে বয়।
বলব গিয়ে বাবর কাছে চাইগো পাতাল রেল,
তুমিও মাগো বাবর পায়ে মাখিও কিছু তেল।
সবশুনে মা বলেন হেসে নোট করেছি সব,
সব হবেরে করিস না আর মিথ্যে কলরব।
সকাল হতে নেইকো দেরী জাগলো বুঝি পাড়া,
চুপটি করে এবার তোরা আমার পাশে দাঁড়া।।

পড়া ও খেলা

সুজিৎ সাঁতরা

পড়াশোনার আছে প্রয়োজন
তার সাথেও খেলা।
অভিভাবকরা ভুলে গেছে
তাদের ছোট বেলা।
বর্তমানে দেখছি শুধু
অভিভাবকদের মনে।
শিক্ষায় উত্তির্ন হতে হবে
আর কিছু না চেনে।
শিশুর মধ্য দিয়ে দিলো
পড়াশোনার চাপ।
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা
ওসব বন্ধ রাখ।
পাশ তো তোকে করতে হবে
নইলে বকা ঝকা।
ফেল করলেতো ঘরে ফিরে
আসছে না আর খোকা।
এ সব নিয়ে আমরা যদি
একটু সজাগ হই।
পুত্র কন্যার শোকে আমরা
কাঁদবো না আর কেউই।।

দুর্গা প্রতিমার আবির্ভাব

দুর্গা প্রতিমার আবির্ভাব এবং মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে অশুভ নাশিনী, অসরদলনী শুভর প্রতীক দেবী রুপে পূজার প্রচলন সঠিক ভাবে কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তার প্রামান্য দলিল কোথাও পাওয়া যায়নি।

তবে বর্তমানে যে দেবী মূর্ত্তির আমরা আরাধনা করি, তা কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে মূর্ত্তিরও যে রুপান্তর ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে দুর্গা আরাধনার এবং পূজার খুব অল্প সম্বন্ধ। এক সিংহবাহিনী মূত্তিরই যে কত পরিবর্তন হয়েছে তার কোন কল্পনা নেই। সিংহবাহিনী মূর্ত্তি চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা এবং অষ্টদশবূজা হয়। বাঙ্গালিদের দশভূজা পর্যন্ত হয় কিন্তু অষ্টাদশ ভূজা প্রতিমা গড়িয়ে পূজা করে না, পূর্বে সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দ্দিতনী মূর্ত্তিতে লক্ষ্ণ, সরস্বতী, কার্ত্তিক গনেশ কিছুই থাকত না। কেবল মায়ের মূর্ত্তি, আর মহষাসুরের বধ। আগের সিংহবাহিনীর সিংহ ছিল অলৌকিক, ঘাড় খুব লম্বা, মুখখানা কতকটা ঘোড়ার মতন, কতকটা মকরের মতন, শাদা, রোগা, টানা ও লম্বা, এক অপূর্ব পশু। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতন এক সিংহবাহিনীর মূর্তি আছে এখনকার মূর্ত্তি কবে থেকে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হয়ে ছিল তা জানা যায় নি। কোন মূর্ত্তিই তন্ত্রোক্ত ধ্যানের মহিত মিলন নেই। অমন টেড়িকাটা, তাজ পরা বাবু কার্ত্তিক পুরান তন্ত্রের কোন পৃষ্ঠায় নেই। লক্ষী সরস্বতীর অমনরুপত কোথাও নেই, তন্ত্রের কোন তন্ত্রের ধ্যানে নেই, পুরানের স্তব স্তোত্রেও নেই, তাহার পর যে ভাবে মহিষাসুর মর্দ্দন হচ্ছে, সে ভাবটাও - সে ভঙ্গিটাও পুরান ও তন্ত্রের কোথাও খুঁজে পাওয়া য়ায় না। তাহার পর চালচিত্র বা সূর্য্যমুখ ছটা যা পিছনে থাকে তবে বিন্যাস এক অপূর্ব পদ্ধতিতে করা হয়। প্রবাদ এই যে, ভাদুরিয়া জমিদার প্রথমে প্রতিমা গড়ে দুর্গোৎসব করেন। আট নয় শত বৎসর আগে। পূর্বে বাঙ্গালায়, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মত ঘট স্থাপন করে যন্ত্রে উপর হোম করিয়া নবরাত্রের উৎসব হত। সে উৎসব হিন্দু মাত্রই করত। তরপর এই প্রকারের প্রতিমা গড়ে কবে থেকে ধুমধামের সহিত পূজা আরম্ভ হয়েছে তা আজ পর্যন্ত কেউ নির্ধারিত ভাবে বলতে পারেনা, কবিকঙ্কনের চন্ডীতে দুর্গোৎসবের কথা আছে, দশভূজা মূর্ত্তির, এমন আধুনিক প্রতিমার মহামহোৎসব সহ পূজার বর্ননা নেই। শ্রী চৈকন্যের সময়ে যে দুর্গোৎসব হত, তাহার অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ঠিক আধুনিক ভাবের পূজা হত কিনা, তাহা কেউ বলতে পারে না, তেমন পরিষ্কার বর্ননা কোন গ্রন্থ বা পুথিতে পাওয়া যায় না, আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সে কি কেবল ঘট স্থাপন করিয়া, চন্ডীর পূজার মতন পূজা ছিল? অনুসন্ধান করে জানা যায় মাটির প্রতিমা গড়িয়া আধুনিক পদ্ধতিক্রমে দুর্গোৎসব আনুমানিক তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন উৎসব নয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হতে আধুনিক পদ্ধতিটা একটু প্রবল হয়েছে। ইংরেজের আমল হইতে এই উৎসব ও পূজা প্রকট ভাবে সমাজে চালছে। আধুনিক দুর্গা প্রতিমার পুরাতন ইতিহাস এবং পর্যায়ক্রমে উন্মেষ পদ্ধতি অনুসন্ধান যোগ্য, উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন প্রকৃত ইতিহাস বহির করিতে পারিলে বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও ধর্ম্মগত ইতিহাসের একটা অঙ্গ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

ভাবের দিকটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা, সমাজের সকলকে নিয়ে সম্মিলিত ভাবে উৎসব করিবার উদ্দেশ্যেই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা। নবপত্রিকা প্রবেশের সময়ে বলতে হয় -

"ওঁ চন্ডিকে চল চল, চালয় চালয়, শ্রীঘ্রং ত্বমম্বিকে পূজালয়ং প্রবিশ।।ত্বং পরা পরমা শক্তিত্বমেব শিববল্লভা। ত্রৈলোক্যোদ্ধারহেতুস্ত্বমবতীর্ণা যুগে যুগে।"

দেবীপুরানোক্ত পদ্ধতিমতেও - "ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবী অষ্টভিঃ শক্তিভিঃ সহ। বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ যঞ্জে সুরেশ্বরি।। দেবী ত্বং জগতাং মাতঃ সৃষ্টিসংহারকারিণী। পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়।।"

এই সবে মন্ত্রে লক্ষী সরস্বতী, কার্ত্তিক গনেশের নাম মাত্র নাই। উহাদের বোধন নাই। তবে উহাদের অর্চ্চনা করিতে হয়। এক একটা পদার্থ্য দিয়া উহাদের সম্বর্ধনা করিতে হয়। গনপতির পূজা না হইলে কোন পূজাই হয় না, সেই হিসাবে গনেশের পূজা হয়, গনেশের প্রতিমূত্তির নয়, চন্ডিকা সকল আয়ুধসম্পন্না, তাই আয়ুধগনের পূজা করিতে হয়। সেটা শক্তি পূজার অঙ্গ স্বরুপ, প্রকৃত পক্ষে তাহাই অস্ত্রপূজা, শক্তি আরাধনার প্রতিক অর্চ্চনা মাত্র। এখন অনেকে নিজের খেয়ালের মত প্রতিমা গড়িয়া থাকে। অনেকে সিংহ বাহিনীই গড়ে না, কেবল উমামহেশ্বর গড়িয়া দুর্গোৎসব করেন। এখন অনেক রকমের প্রতিমা দেখতে পাওয়া যায়। অতএব বুঝতে হবে যে, প্রতিমা আরাধ্য নহে, উমা ঘরসাজানো সামগ্রী।

জেলার খবর সমীক্ষা

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ২৪টাকা

যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায় নিচের কুপনটি পুরণ করুন আর পাঠিয়ে দিন

নাম .....

ঠিকানা.....

.....

..... ফোন নং .....

আপনার নিকটবর্তী পত্রিকা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা আমাদের পত্রিকা অফিসে চলে আসুন।

গহন অরন্য আর নীল পাহাড়ের দেশ অসম

তীর্থক্ষেত্র ছাড়াও পর্যটকদের কাছে অসমের অন্যতম আকর্ষণ হল অরন্যের হাতছানি। গহন অরন্যের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়ে চলতে চলতে দু একটি বন্য জন্তুর ডাক যদি হঠাৎ কানে আসে, হয়ত বা লোম খাড়া হয়ে উঠবে। তবুও এ এক অন্য অনুভূতি। এক অন্য মেজাজ। অসমে কি দেখবেন? কোথায় থাকবেন? তারই ইতিবৃত্ত দিয়েছেন স্বর্গীয় কল্যান ঘোষ।

হিমালয়ের পদতলে গহন অরন্যে ঘেরা, বিশাল উপত্যকা, সারি বদ্ধ অসংখ্য নীল বর্নের পাহাড় আর তার মধ্যে এক বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র। সব মিলে মিশে পশ্চিমবঙ্গের পাশেই এক প্রদেশ অসম। প্রাচীন কালে বলা হত প্রাগ্‌যোতিশপুর। পরবর্তী কালে কামদেবের শহর বলে 'কামরূপ'-এর এক নামকরন হয়েছিল। বর্তমানে আসাম বা অসম। অসমের বুকচিরে বয়ে গেছে ব্রম্ভপুত্র, বরাক, মানস সহ অসংখ্য নদনদী, শাখানদী ও উপনদী। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে অসম যেন প্রকৃতির আশির্বাদ পুষ্ট। প্রকৃতি যেন প্রান ভরে অসমকে সাজিয়ে রেখেছে। কেউ কেউ বলেন অসম যেন প্রাকৃতিক এক ম্যাজিক, সবুজের স্বর্গভূমি। যেমন রয়েছে নীলবর্নের পাহাড়, রক্তিম নদী তেমনই রয়েছে গভীর অরন্যের মধ্যে এক শিং ধারী গন্ডার, হাতীর পাল, বাইসন এবং অন্য জন্তুর দল।

অসমে রয়েছে একান্ন পীঠের এক পীঠ দেবী কামাক্ষ্যা মন্দির। প্রাচীন প্রত্নতত্বের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ, মিনার, দুর্গ মাজার প্রভৃতি।

বসন্ত ও শীত ঋতু অসম ভ্রমনের আদর্শ সময়। অর্থাৎ অক্টোবর থেকে এপ্রিল।

অসমের আর এক দর্শনীয় হল এপ্রিলে অহমিয়াদের জাতীয় উৎসব বিহু। নারী-পুরুষ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাদ্যযন্ত্র সহকারে নাচে গানে এক মিলোনোৎসব। আর বসন্ত কালে অনুষ্ঠিত হয় এক আনন্দ মুখর রঙ্গালী বিহু উৎসব। অহমিয়াদের কাছে এর সার্থকতা হল বীজরোপনের আগে এ এক মঙ্গলময় উৎসব।

কী দেখবেন?

কামাক্ষা মন্দির ঃ গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে ৮মাইল দুরে নীলাচল পাহাড়ের উপর একান্ন পীঠের এক পীঠ এই দেবী মন্দির। জনশ্রুতি এখানে দেবী সতীর যোনিদেশ পড়েছিল। তাই এখানকার দেবী কামরূপ কামাক্ষ্যা। আর কামাক্ষ্যা হল তন্ত্র সাধনার এক পবিত্র সাধন ক্ষেত্র। দেবীর বিশাল মন্দির আর চত্বর। শহর থেকে বাস আপনাকে মন্দিরে পৌঁছে দেবে। মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে শায়িত এক প্রস্তর খন্ডে লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা দেবীর এই কাল্পনিক মুর্তি। অম্বুবাচীর সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পুন্যার্থী এখানে দেবীর কৃপালাভ করতে আসেন।

নবগ্রহ মন্দির ঃ চিত্রাচল পাহাড়ের উপর এই নবগ্রহ মন্দির। এখানে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গ্রহবিজ্ঞান শাস্ত্রের গবেষনা কেন্দ্র আছে।

উমানন্দ মন্দির ঃ ব্রম্ভপুত্র নদের মধ্যে এক দ্বীপের মাঝখানে এই শিব মন্দির। এই শিবকে অহমিয়ারা বলেন উমানন্দ শিব। নৌকা করে মন্দির চত্বরে যেতে হয়। কাছারি ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ে।

বশিষ্ঠ আশ্রম ঃ মহান মুনিবর বশিষ্ঠ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুয়াহাটী থেকে ১২ মাইল দুরে সন্ধ্যাচল পর্বতের উপর। এখানে সন্ধ্যা, ললিত ও কান্ড তিনটি নদী মিলিত হয়েছে।

কাজিরাঙা ঃ মন্দির ছাড়া পর্যটকদের কাছে অসমের বড় আকর্ষন হল অরন্যের হাত ছানি। মনে করুন গহন অরন্যের মধ্যে হাতীর পিঠে চেপে চলেছেন। হঠাৎ কানে এল বন্যজন্তুর ডাক। হয়ত বা লোম খাড়া হয়ে উঠবে। তবুও এ যেন এক অন্য অনুভুতি অন্য মেজাজ।

গুয়াহাটি থেকে ২১৭মাইল দুরে ন্যাশনাল হাইওয়ের কাছে ৪৫০ স্কয়ার ফুট এলাকা জুড়ে গহন অরন্য কাজিরাঙা। অরন্যে রয়েছে গন্ডার, ওয়াটার বাফেলো, হাতির দল, বিভিন্ন হরিন, বাইসন, বাঘ প্রভৃতি বন্যজন্তু আবার তার পাশেই জলাশয়ে অসংখ্য পেলিকান বুক ডুবিয়ে খেলায় মত্ত। এ এক অনবদ্য ছবি। এখানে রাত কাটাতে রয়েছে বার ও রেস্টুরেন্ট সহ টুরিস্ট লজ, ফরেষ্ট লজ, অরন্যে ঘোরার জন্য জীপ পাবেন। তবে তার চেয়ে ভালো লাগবে হাতীর পীঠে চেপে ঘুরতে।

মানস ব্যাঘ্র প্রকল্প ঃ মানস নদীর তীরে ন্যাশানাল পার্ক। ওয়াহাটি থেকে ১৮০ কিঃমিঃ দুরত্বে ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার জায়গায় প্রাকৃতিক বৈচিত্রে দুর্লভ বন্য জন্তুদের এক মিলন ক্ষেত্র। এর বনাঞ্চলে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, বুনো হাতি থেকে অসংখ্য ময়ূরের দল। প্রবেশ করতে বংশবাড়ী চেক পোষ্ট থেকে অনুমতি নিতে হয়। ইচ্ছা হলে রাতে বাঘের ডাক শোনার জন্য রাত কাটাতেও পারেন অসম সরকারের থ্রিস্টার হোটেল, এখানে আপনাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মানসে আসতে হবে বরপেটী রেল স্টেশনে নেমে জীপ বা অন্য গাড়ীতে।

অসমের রাজধানী গুয়াহাটী ও তার আশে পাশে অসংখ্য ঐতিহাসিক মন্দির, মিনার, দূর্গ, জলাশয় ও প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আজও কালের স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে। ওয়াহাটির পূর্ব দিকে ৩৩৯ কি.মি. দুরে

ব্রিটিশ আমলের আগে ছশো বছরেরও বেশি বলশালি অহমিয়া শাসক বর্গদের রাজধানী ছিল জেলা শিবসাগর। সুন্দর শহরটিকে ঘিরে রেখেছে ২০০ বছরের প্রাচীন এক জলাশয়। তার তীরে ১৭৩৪ সালে রানী মদম্বিকা তৈরী করেছিলেন শিবদোল, বিষ্ণুদোল ও দেবীদোল নামে তিন শিব মন্দির। এর মধ্যে শিবদোল উচ্চতায় ১৩৪ফুট ও পরিসীমা ১৯৫ফুট।

শিবসাগর যেন ভগবান শিবের প্রতি উৎসর্গীকৃত। এখানে দর্শনীয় ৬ মাইল দুরে রাজা রূদ্র সিংহের তৈরী একটি সাততলা বাড়ী, যার তিনটি তলা রয়েছে মাটীর তলায়। নাম তলাতল ঘর। আর উপরের অংশের নাম তারেঙ ঘর। এর ১৩ মাইল দুরে রয়েছে পঞ্চদশ রাজা শুকলেন মুঙ মুঙ এর ১৫৫০ সালে তৈরী গারগাঁও প্রাসাদ।

শিবসাগর থেকে ৫ কি.মি. দুরে ডিম্বাকৃতি এক শিবির রঙ ঘর। কথিত আছে এখানে বসে অহমিয়া রাজারা হাতীর লড়াই পরখ করতেন। শিবসাগর শহর থেকে ১২ মাইল দুরে রানী ফুল পরী ১৫০ একর এলাকা নিয়ে এক বিশাল জলাশয় খনন করে দেবী দুর্গার নামে উৎসর্গ করেন। তাই এর নাম করন গৌরী সাগর।

তেজপুর ঃ গুয়াহাটি থাকে ১৮১ কি.মি. পথে তেজপুর। লোকশ্রুতি এখানে হরি (কৃষ্ণ) এবং হর (শিব) এর মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। শহর হয়েছিল রক্তাক্ত। তাই এর নাম তেজপুর। অসমের সমস্ত শহর থেকে এখানে আসার বাস রয়েছে। এখানে দেখার মধ্যে রয়েছে বামুনী পাহাড়, হাজরা জলাশয়, মহাভৈরব ও ভৈরবী মন্দির। থাকতে পারেন। রয়েছে ডাকবাংলো।

গুয়াহাটিঃ অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সুন্দর শহর। গুয়াহাটি রেল স্টেশন থেকে ৫ কি.মি. দুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানা। স্টেশন থেকে ১০মি. হাঁটা পথে মিউজিয়াম, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রম্ভপুত্র নদীর উপর সরল সেতু ও তৈল শোধনাগর। এই দর্শনীয় স্থানগুলি অসম সরকারের কনডাকটেড ট্যুরের মাধ্যমে প্রতি বুধ ও রবিবার দেখানো হয়। গুয়াহাটি থেকে সপ্তাহে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শনিবার কাজিরাজা টুরিস্ট বাস যায়। থেকে পর দিন। খাওয়া থাকা হাতীর পিঠে বেড়ানো সহ খরচ বড়দের ৪৭০ ও ছোটদের ৩৬৫ টাকা।

কেনাকাটা ঃ যারা কিনতে ভালবাসেন তাদের জন্য অসমে রয়েছে বিভিন্ন জিনিস। যেমন অসমের সিল্ক, মুগা বা পাঠ সিল্ক অথবা ভারতের বিখ্যাত স্বর্নালী সিল্ক ও মুগার কাপড় অনবদ্য। আর ঘর সাজানোর জন্য রয়েছে নানান সম্ভার। অহমিয়া শিল্পীদের হাতের বাঁশের তৈরী বিভিন্ন আসবাব পত্রাদি থেকে টুকিটাকি ঘর সাজানোর সরঞ্জাম। পাবেন বেলি মেটালের বাসন পত্র। আর ফেরার সময় অসমের বিখ্যাত চা কিন্তু ভুলবেন না।

কিভাবে যাবেন?

হাওড়া থেকে কামরূপ এক্সপ্রেসে পরদিন পৌঁছে যাবেন রাজধানী গুয়াহাটি গহন অরন্য আর নীল পাহাড়ের দেশে। যাবার আগে অসম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন। টুরিষ্ট ইনফরমেশন সেন্টার, অসম ভবন, ৮ র‍্যাসেল স্ট্রীট কলকাতা ৭১। এছাড়া গুয়াহাটীতে নেমে আসম সরকারের টুরিষ্ট লজে থাকতে গেলে 'অসম তথ্য কেন্দ্র, স্টেশন রোড, গুয়াহাটি ৭৮১০০১ তে যোগাযোগ করতে পারেন।

কোথায় থাকবেন?

থাকার জন্য অসমে পাবেন বিভিন্ন মানের অসংখ্য হোটেল। তার মধ্যে হোটেল ব্রম্ভপুত্র, অশোক হোটেল, বেলভিউ, হোটেল ঋতুরাজ, পরাগ, কন্টিলেন্টাল, উর্বশী, কুবের, হোটেল অম্বরীশ এবং সরকারী টুরিস্ট লজ।

অসমে ভ্রমনকালীন সাহায্যের জন্য অথবা টিকিট বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন, বায়নো ট্রাভেলস, পানবাজার গুয়াহাটি ৭৮১০০১, সেক ট্রাভেলস, আমবাড়ী গুয়াহাটী ৭৮১০০১, অসম ভ্যালী ট্রাভেলস পল্টন বাজার গুয়াহাটী এবং নেটওয়ার্ক ট্রাভেলস পল্টন রাজার গুয়াহাটী।

মন্দারমনি

গোবিন্দ লাল বন্ধোপাধ্যায়

সমুদ্রতট বলতে আমরা পুরী, ধীঘা বুঝি। কিন্তু বর্তমানে আরও কেটি মনোরম সুন্দর সমুদ্র তট তৈরী হয়েছে, যা মন্দারমনি নামে খ্যাত। হাওড়া হইতে দীঘাগামী বাসে অথবা ধর্মতলা হইতে সি.টি.সি. বাসে করে প্রায় ৩ ঘন্টা যাত্রা করে চাওলাসোলায় নামতে হয়। সেখান থেকে প্রাইভেট গাড়ী অথবা টেকারে করে যেতে প্রায় ৪৫ মিনিটের মত প্রায় সময় লাগে। এই ৪৫ মিনিটের রাস্তার প্রায় ১৫মিনিট যেতে হয় সমুদ্রতট ধার ধরে , যা এখানকার অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য। এর মাঝেই আছে অনেক সুন্দর রিসর্ট।

যারা নির্জনের পূজারী অর্থাৎ যারা নির্জন জায়গা পছন্দ করেন তাদের জন্য মন্দারমনি একেবারে উপযুক্ত স্থান, মন্দারমনি থেকে কিছুক্ষন হাঁটলে একটি সমুদ্রের খাঁড়িতে পৌঁছানো যায়। যা মোহনা নামে অধিক পরিচিত। মন্দারমনির সমুদ্রের ঢেউ অতি প্রবল নয়। এখানে নিশ্চিন্তে আনন্দে স্নান করা যায়। তাই গরমের ছুটিতে কিংবা পুজোর ছুটি উপভোগ করার জন্য মন্দারমনি অতি উপযুক্ত জায়গা।

বার্থ ডে গিফট্

শক্তিব্রত ভট্টাচার্য্য

তোর 'হ্যাপি বার্থ ডে' তে
প্রি, অরি, নীতাদের সাথে
আমারও নিমন্ত্রন ছিল।
দোতলার বারান্দা
উৎসব মুখর, নানান রঙের,
সাইদের হরেক মডেলের
বেলুন। পিছনের দেওয়ালে
বড় বড় করে লেখা 'হ্যাপি বার্থ ডে'।
ফুলের গন্ধ টপকে বিড়িয়ানি
গোল্ড মেডেল জয়ী।
প্রি' র হাতে ছিল
একটা গানের বই, তোর জন্য।
আমার হাতে একটা ডাইরি,
আর দুটি চারা গাছ, কৃষ্ণচূড়া আর কামিনী।
টি টেবিলে মোমবাতি
পরিবেষ্টিত সুদৃশ্য কেক, ছুরির
অপেক্ষায়। 'হ্যাপি বার্থ ডে' গান
দিয়ে কাটা হল কেক। আমার
ভাগ্যেও জুটেছিল একটুকরো।
মুখে দিতেই মিলিয়ে গেল
মুহূর্তে। মিষ্টি হেসে হাত
বাড়িয়ে নিলি 'আবোল তাবোল'
গানের ক্যাসেড, আর ভ্রু কুঁচকে,
ডাইরিটাও। আর চারা গাছ দুটোকে
সবার সামনেই সটান ছুঁড়ে দিলি।
গিয়ে পড়ল রাস্তার ওপারে পুকুর ধারে
এত বছর পর
অবলেহাতে ও দাঁড়িয়ে গেছে
নিজেদের পায়ে, তোর
বারান্দার দিকে তাকিয়ে।
কালবোশেখির সন্ধ্যা ছিল
কাল। আজ সকালেই আমার
স্বপ্ন বাস্তব হল। কামিনী তার
সাদা পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে।
কৃষ্ণচূড়ার এক থোকা
লাল ফুলে একটা ছোট্ট পাখি
সরু ঠোঁট দুটি দিয়ে মধু খাচ্ছে।
একি! তোর চোখ
যে এখানেই আটকে।
পাতলা ঠোঁটের মাঝে ঝিলিক।
সকালের চুল এলো মেলো।
আমার হাতে টুথ পেষ্ট
লাগানো ব্রাশ।
তোর ফেলে দেওয়া
আমার স্বপ্নের উপহার,
আজ গ্লোবাল ওয়ামিং -এর
পৃথিবীকে দিলাম।

ঘড়ি

মুকুল চ্যাটার্জ্জী

টিক টিক চলে ঘড়ি
আপনার খেয়ালে।
সময়টি বলে দেয়
বাঁধা থেকে দেওয়ালে।।
সময় জানায় সদা
বাহু দুটি ঘোরায়ে।
কাজের বিরাম যবে
দম যাবে ফুরায়ে।।
মাঝে মাঝে দুমদাম
ফেলে দিয়ে ঘন্টা।
সময়ের তালে আনে
অচেতন মনটা।।
মোরা সময়ের অনুগামী
হয়েছি এখন।
যদিনা থাকতো ঘড়ি
কি হতো তখন?

কবে কোথায় কী

আপনার এলাকার কবে, কোথায়, কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে তা জানালে আমরা আগের সংখ্যায় তা প্রকাশ করব 'কবে কোথায় কি' কলমে। পোষ্ট কার্ডে পরিষ্কার করে লিখে সংগঠনের নাম সহ লিখতে হবে অথবা আপনাদের আমন্ত্রনী পত্র পাঠাবেন।

নিচের ঠিকানায়

' কোথায় কি '
জেলার খবর সমীক্ষা
শিবনাথ চক্রবর্ত্তী
গ্রাম-পোঃ অমরাগড়ী, জয়পুর, হাওড়া।
উল্লেখ্য টেলিফোনে জানালে তা ছাপা সম্ভব নয়।

আপনাদের সেবায় ফোন ঃ ২৩৮-৫১৫ / ১৫৬, ৯৭৩৪৫১৫০৫৫

ভৌমিক ডক্টরস্ চেম্বার

ঝিখিরা পাইকবাসা মোড়, জয়পুর, হাওড়া।

সময় - সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকাল ৪টা থেকে ৯টা

বাড়ি ঃ গ্রাম - নকুবাড়, পোঃ ঝিখিরা, জয়পুর, হাওড়া।
সময় - সকাল ৬টা-৮টা পর্যন্ত

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সময় সূচী

চর্মরোগ ঃ ডাঃ এস.এন. গোস্বামী ঃ বৈকাল ৩টা
শিশুরোগ ঃ ডাঃ এম. সরকার ঃ শনিবার সকাল ১১টা - দুপুর ১টা
স্ত্রীরোগ ঃ ডাঃ মিসেস্ সম্পা দাস ঃ শনিবার বিকাল ৩টায়
দন্ত ঃ ডাঃ মৃনাল ভট্টাচার্য ঃ রবিবার দুপুর ১টা

জেনারেল ফিজিসিয়ান এবং কিডনি, স্টোন, অ্যাপেনডিক্স, অর্শ, হার্নিয়া অপারেশন করেন ঃ ডাঃ তাপস খামরুই ঃ রবিবার বিকাল ৪টা
ফিজিওথেরাপী, প্যারালাইটিস যে কোন যন্ত্রনার উপশমের জন্য ঃ ডাঃ অশোক মালিক ঃ মঙ্গল বার ১১টা
নাক, কান গলা ঃ ডাঃ এন. জি. মাজি ঃ সময় - প্রতি শুক্রবার বৈকাল ৪টা - ৬টা।

জননী ও দেবী সারদা

বিনয় শংকর চক্রবর্ত্তী

ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহ ধর্মিনী জননী সারদার জীবনী আলেখ্য আলোচনা করা আমার মতো ক্ষুদ্র ক্লীবের ধৃষ্ঠতা ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। অন্যের কাছে পরিহাস ছাড়া আর কি! পাঠকবর্গের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা এই যে, যদি আমার লেখায় বা বলায় অসংলগ্ন থাকলে নিজগুনে ক্ষমা করবেন। এখন ১৫০ বছর পূর্তির প্রাক্কালে এটুকু বলতে পারি যে, একাধারে জননী ও অন্য দিকে দেবী বলিয়া সর্বজন বিদীত। এখন দেখা যাক যে, গর্ভে ধারন না করেও ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গি নী জননী হলেন, তাহাই মখ্য বিষয়। সাধারনতঃ গর্ভে যে মাতা সন্তানকে ধারন করেন বা জন্ম দেন তিনি জননী হবার অধিকারী। কিন্তু কৌতুহল হয়, গর্ভে ধারন না করেও যে জননী হওয়া যায় কিভাবে সেটাই মুখ্য বিষয়। এর উত্তর আমরা সহজেই পেয়ে যাই যে, ঠাকুরের অঙ্গুলী নির্দেশে জয়রাম বাটী থেকে কামার পুকুরে মা সারদা ঠাকুরের সহধর্মিনী হয়ে এলেন অথচ কোনো সন্তান তার হল না আবার বিশ্ববাসীর কাছে তিনি জননী হিসাবেগন্য হলেন। যদি আমরা একটু গভীরে যাই - তাহলে দেখতে পাই যে, ঠাকুর নিজেই একজায়গায় বলেছেন - "তোমার একটা সন্তান বর মাগছো, কত সন্তান যে চার পাশে কিলবিল করবে তার আর ইয়াত্তা থাকবে না।" পরবর্তী কালে তাঁর নিদর্শন পাই নরেন, গিরীশ, তুরিয়ানন্দ, শিবানন্দজী প্রমুখ আরো সব কত সন্তান মায়ের সান্নিধ্যে এসেছেন (চিন্তা বহির্ভুত) তা বলাই বাহুল্য। কাজেই এখানে নারী গর্ভে ধারন করলেই যে জননী হবে আর গর্ভে ধারন না করলেও জননী হওয়া যায় সেই দিব্য দৃষ্টি ঠাকুরের ছিল বলেই মাকে অমোন বানী শুনিয়েছিলেন। তাই পরবর্তী কালে তিনি জননী হ'তে পেরেছিলেন। অবশ্য মা সারদা সন্তান বাৎসল্য, আন্তরীকতা ও সহৃদয়তা গুনেই আসন অলংকিত করেন। তার নিদর্শন পাই মা সারদাকে বলতে ঠাকুরের নিদর্শন "ওগো নরেন এসেছে। আজ রাতে থাকবে।" শুনেই মা সারদা সহকারী লক্ষীদিকে আদেশ করেন - " আরো দুটো আটা মাখো। তার সঙ্গে অড়হর ডাল রাঁধো।" এথেকে মা সারদার সন্তান বাৎসল্য পরিচয় সহজেই চোখের সন্মুখে ভেসে ওঠে। আরো নিদর্শন পাই ঠাকুরের মুখের কথায় তাহল - " আমার তিনজন মা। মন্দিরে মা - ভবতারিনী, নহবতে দ্বিতলে গর্ভধারিনী ও তয়ত এক তলে তুমি সারদা।"

এরূপ আরো নিদর্শন উল্লেখ করা যায়। যখন নহবতে মা সারদা শুধু স্বামীর নয়,সকল ভক্তের সেবাদর্শনে মুগ্ধ হয়ে নরেন নিজের মায়ের সাথে এক আসনে বসাবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কাজেই মা সারদা একাধারে সেই সব সন্তানদের গর্ভে ধারন না করেও বাৎসল্য প্রেমে মাতৃত্বের আসন যে পেয়েছিলেন - তা সত্যিই বিষ্ময়। এই ভাবে দেখা যায় যে কতোনা নিদর্শন আছে যা মা সারদার জননী হিসাবে সহজেই চোখে ভেসে ওঠে। এইবার দেখি 'দেবী' হিসাবে কিভাবে মা সারদা পরিলক্ষিত হন তাহাই গেখার। আমরা সাধারনতঃ মা সারদা ঠাকুরের অর্ধাঙ্গিনী বলেই জানি। আর এও জানি যে, মা সারদা শুধু ঠাকুরের অর্দ্ধাঙ্গিনী নয়। দেবী হিসাবে ঠাকুরের কাছে পরিলক্ষিত হন। তাইতো ঠাকুরের মাকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজো করেছিলেন "তুমি ষোড়শী, তুমি ভূবনেশ্বরী, তুমি সরস্বতী। এযে মা সারদার ঠাকুরের কাছে যে সার্টিফিকেট পান পরবর্ত্তীকালে শুধু আপামর সাধুভাইরা নয় বিশ্ববাসীর কাছে দেবী বলেই উদ্ভাসিত হন। এরূপ আরো নিদর্শন পাই যে, যখন মা সারদা জয়রাম বাটী থেকে কামারপুকুরে (শ্বশুরবাড়ী) আসছিলেন পথে এক ডাকাতের সন্মুখে পড়লে ডাকাত রাস্তা দেবে না পরিশেষে মা সারদা 'কালীমূর্তি' ধারন করলে ডাকাত পথ ছাড়ে। এথেকে আমাদের সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি মানবী নন, তিনি দেবী। এরূপ আরো নিদর্শন পাই নরেনের এক উক্তির মধ্যে। তখন হবে ১৮৯৪ সন। আমেরীকা থেকে স্বামী শিবানন্দজীকে পত্রে লিখেছেন - 'মা ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি। উনি জ্যান্ত দূর্গা। ঠাকুরের নামে একটি মঠ মঠ স্থাপন করব আর পাশে মাকে বসাবো।" এই আমাদের মা সারদা। বিশ্ববাসীর কাছে তাইতো তিনি জননী ও দেবী আখ্যায় ভূষিত হন। তাই আজ ১৫০ বছরে মা সারদা পূর্তি দিবসে প্রণাম জানাই - ওঁ স্থাপকায় সর্বধর্ম স্বরূপিনে অবতার ধারষ্টায় ভগবতে রামকৃষ্ণায় তে নমঃ / মা সারদাং জননীং দেবীং রামকৃষ্ণং পাদপদ্মে মুর্হুমুর্হু।

ছন্দে রামায়ন

অসিত কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

১। সপ্তকান্ড রামায়ন পড়ে
প্রচার কর (প্রতি) ঘরে ঘরে।
মনুষ্য জন্ম দুর্লভ অতি
রামায়ন পাঠে লাগুক মতি।।

২। যেই রাম সেই কৃষ্ণ
এযুগেতে রামকৃষ্ণ।
যত মত তত পথ
মান্য করে সারা জগৎ।।

৩। রামরাজ্যে কেহ রবে না অসুখী
রামরাজ্য গড়ায় আমরা উন্মুখী।
বিবেকের বাণী আলোকের মনি
দিকে দিকে আর্তের উল্লাস-ধ্বনি।।

৪। মানুষের দেহে অশেষ যন্ত্রনা
সহিতে পারি যেন, নহেক কল্পনা
ঘাত প্রতিঘাতে হয়েছি জর্জরিত
তাই বলে হব নাক বিশেষ চিন্তিত।।

৫। নির্মল কুমার (জ্যেষ্ঠভ্রাতা) রচিল 'রামায়ন অংশ'
আমি তাতে দিলাম ছন্দ কিয়দংশ।
রামায়নের কথা অমৃত সমান
অসিত কুমার ভনে শোনে পুন্যবান।।

৬। রামকৃষ্ণের কথা অমৃত সমান।
যারা যারা শোনে তারা পুন্যবান।।

৭। পরমাত্মার সন্ধানে প্রতিমা গড়ি
ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধমুখী, আহামরি।
আজকের সাহিত্যে প্রতীকের ছড়াছড়ি
ধর্মের জগতে নেই কোন কড়াকড়ি।।

৮। চির দুঃখী সীতারাম।
পথ দেখাচ্ছেন অবিরাম।।

৯। কভু কৃষ্ণ কভু রাম
গাই নাম অবিরাম।
সীতাপতি জয় রাম
হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।

নর্মদার প্রপাত উজানে

নিমাই মান্না

আশ্চর্য সাদা-নীল
স্ফটিক পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে
যতোদূর পারি
ততোদূরই আগিয়ে যাবে
নর্মদার প্রপাত উজানে

যদিও গিলে খেতে আসছে
প্রতিটি মূহূর্তেই
রূপকথার হিল্‌হিল্‌ নানান বিপদ,
হাতে শক্ত হাল তবুও এগিয়ে যাই
যতোটা পারি
ততোটাই
ভেরাঘাটে নর্মদার প্রপাত উজানে।।

৩এপ পাতার পর

শারদীয়া উৎসব
প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যাশা

কাবেরী কাঁড়ার

প্রেরনায় সামর্থ্যমত অর্থ দিয়ে অনুষ্ঠানকে সফল করতে সাহায্য করবে। থাকবে না কোন বাধ্যবাধকতা, থাকবে না কোন প্রভেদের মনোভাব। মানুষ তার প্রানের প্রেরনায় স্ফতস্ফূর্তভাবে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করবে। উৎসব হবে সাংস্কৃতিকে বিকশিত করার মাধ্যম। উৎসবের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই মানুষকে সচেতন করা যাবে, যাতে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে। পৃথিবীতে প্রত্যেকটা প্রাণ পাবে বাঁচার রসদ।

উৎসবের ক্ষেত্র হতে পারে মানুষের পারস্পরিক মত আদান-প্রদানের মিলন ক্ষেত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ক্ষেত্র ইত্যাদি। তা না হলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, মৈত্রীর বন্ধন তৈরী হবে কিভাবে? উৎসব যদি শুধুমাত্র আসে আর তার জৌলুস ছড়িয়ে চলে যায় তাহলে সেই উৎসব অগ্রগতির তুলনায় অবনতিকে বেশী ডেকে আনবে। আমাদের উৎসবকে আমাদের হিতে লাগাবার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। সব রকম ভেদাভেদ, সংকীর্নতা, আর্থিক অসাম্য দূর করে আমাদের মিলিত হতে হবে এক মিলনক্ষেত্র।

একটি গাছ একটি প্রাণ

মনিরুল ইসলাম মল্লিক

কোন বিস্তীর্ন অঞ্চল বা এলাকা জুড়ে বড় ও ছোট গাছ সহ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের সমাবেশ বন বা অরন্য হিসাবে পরিচিত। এই গাছ জলবায়ুকে প্রভাবিত করে বন্য প্রাণীকে আশ্রয় দান করে বা উপযুক্ত পরিবেশে বন্যপ্রাণী সমূহ লালিত পালিত করে। মানুষের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরনে সহযোগীতা করে। যথা - খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি সুযোগ করে দেয়। এছাড়া জীবকূলের বেঁচে থাকার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আমাদের দান করে জীবকূলকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

পরিবেশ রক্ষায় গাছ তথা অরন্যের অবদান অতুলনীয়। অত্যাধিক তাপ এবং শৈত্য নিয়ন্ত্রন সহ বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম এই অরন্য। এই কারনে পৃথিবী পৃষ্ঠে অসংখ্য প্রাণী বেঁচে থাকতে সক্ষম। অরন্য আঞ্চলিক বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রন করে। এছাড়াও ভূমিক্ষয় রোধ, নদীর গভীরতা বজায় রাখা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। অরন্য হল বন্যপ্রানের বাসস্থান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে অতিকায় গন্ডার, হাতি, বাঘ ও সিংহের মতো বন্য পশুর একমাত্র বাসস্থান হল অরন্য।

গাছ বজায় রাখে পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের ভারসাম্য। বিনিময়ে কার্বন-ডাই- অক্সাইডের গরল গ্রহন করে নিজে হয় নীলকণ্ঠ। একটি গাছকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ একটি প্রানের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখা। তাছাড়া গাছও যে প্রাণীজগতেরই একজন একথা আমাদের ভোলা চলবে না।

কিন্তু কালক্রমে পৃথিবী জুড়ে গ্রামীন জীবনের স্থানে এল নগরসভ্যতা। ঘর-বাড়ি, কলকারখানা, শিল্প, রাস্তা, ব্রীজ প্রভৃতি নির্মান এর জন্য দিকে দিকে অরন্য ধ্বংস করে চলছে আর পৃথিবীকে বা পৃথিবীর জীবকূলকে ধ্বংসর পথে ঠেলে দিয়েছি। তাই গাছ আজ তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানব জাতীর কাছে দুঃখে অভিমানে অভিযোগ করে চলেছে -

বাঁচতে চাই বাঁচতে চাই
আমি বাঁচতে চাই।
এই পৃথিবীর বুকেই আমি
বাসা বাঁধতে চাই।।
মাটিকে আমি আঁটকে রাখি
প্রকৃতির ক্ষয় থেকে।
তবু দিকে দিকে কাটছে মোরে
অবিবেচিত ভাবে।।
বৃষ্টি আমি নিজেই আনি
শুষ্ক আমি আদ্র করি।
উষ্ণ আমি শীতল করে
বাস্তুরীতি রফা করি।।
তবু চেন নাকি মোরে
আমিই পাইন, আমিই ফার
আমিই আম, জাম।
বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই
আমি বাঁচতে চাই।।

সুকান্ত প্রাঙ্গনে

প্রণব ভট্টাচার্য্য

তোমার উদাসীন ভাবুকতা
আজ অবিদিত বিষয়মাত্র নয়।
তোমার তেজদীপ্ত কবিতার লাইনগুলোর স্পর্শে
রোমাঞ্চিত হতে হয় অনেককেই।
জীবনের অনেকখানি পথ বাকী থাকতেই
হারিয়ে গেছ তুমি;
স্ফুরিত, প্রতিভার যে আভাস
তুমি দিয়েছিলে আমাদের,
বর্নচ্ছটার সুকান্তিতে
সসম্মানে আজ তা রক্ষিত।
সময়ের নিষ্ঠুর কষাঘাতে
অকালেই কবলিত হলে তুমি
রেখে গেলে তোমার
সুকান্ত সৃষ্টি সম্ভার।
লেখনীর প্রতিটি সাবলীল পদচারনে
নির্মলকান্তির অনির্বান প্রভায়
প্রজ্জ্বলিত হয়ে থাকার
প্রেরণা দিয়ে গেলে তুমি সবাইকে,
যে প্রেরণা আজও
দূরন্ত লহমায় স্বতোদ্ভাসিত
তোমার লেখনীর দূরন্ত গতিময়তায় অচিরেই
'ঝলসানো রুটি' র দূর্যোগ সরে গিয়ে
ক্ষরিত হবে চন্দ্রিকা-
তোমার সমুজ্জ্বল বাক্যদ্যুতির
নির্মল আভায়
বন্দনা হবে সুন্দরের,
সাধনা হবে মনুষ্যত্বের -
প্রার্থনা হবে জাগরণের;
তোমার ভাবময় মূর্তিপ্রাঙ্গনে।

স্বাধীনতা

সেখ বক্তিয়ার রহমান

১৯৪৭ এর ১৫ই আগষ্ট,
মধ্যরাতের তিমির ছিন্ন করে -
স্বাধীনতালাভের প্রমত্ত উচ্ছাস।
দুশো বছরের নাগপাশ থেকে বন্ধন মুক্তির
সে এক বাঁধ ভাঙা আবেশ।
কোমল স্নিগ্ধ বাতাসের প্রাণচীরে,
ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডিন হতে না হতেই,
হাতে হাতে রং মশাল আর -
বোমা পট কার তুমুল গর্জন।

এখন শুধু বাঁশি,
দিকে দিকে অনাবিল আনন্দ সঙ্গীত।
যদিও অন্ধ ধর্ম বুদ্ধি -
টুকরো করে দিল মোদের দেশের মাটি,
তবু যে স্বাধীনতা সে যে -
মোদের প্রাণের চেয়ে প্রীয় স্বাধীনতা।
এখন যেন আবার ফিরে যেতে চাই - .
সেই ফেলে আসা উৎসবের রজনীতে।
মনে হয় যেন -
যদি শহীদেরা সবাই আবার,
নতুন করে জেগে উঠতে পারত,
তাহলে, কী আনন্দই না হত!!

আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আমরা।
ভারত আজ এ কোন কম্পনে শিহরিত?
ছিঁড়ে যাচ্ছে সংহতির বাঁধন,
বিচ্ছিন্নতার নাগীনীরা ফেলছে বিশাক্ত নিঃস্বাস।
কেন্দ্রে টল মল সরকার,
নেতায় নেতায় চলছে ঝগড়া।
তা দেখার লোক কই?
বেকার বেকারী ছুটে চলেছে,
কাজ চাই কাজ -
কে দেবে কাজ? কোথায় সেই পরিকল্পনা?
কেবল যারা গদিতে আসীন,
তাদের সন্তান সন্ততীর জুটেযাবে কাজ।
বাকীরা অন্ধকারে অবলিন।

জনগন শুধু ভোট দিচ্ছে,
আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে,
দেখছে নররাক্ষসদের প্রবল নৃত্য।
মন্ত্রী নতুন সেতুর ফিতে কাটছেন,
পথ দখল করা মিছিলে
দেশের জনতা স্তব্ধ।

তবু রুখে দাঁড়াতে হবে বৈকি,
আজকের এই সমারহের দিনে।
নতুন প্রজন্ম কী এখনও বুঝবে না
কী তাদের করনীয় কাজ?
আসুন না সবাই মিলে আমরা
আবার সেই তেমনি একটা সংগ্রামে,
আবার একটা নতুন সংগ্রামে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাপিয়ে পড়ি।
সময় ডাক দিচ্ছে করুন কণ্ঠে
সেই প্রেসিডেন্সি থেকে পাঠশালা অবধি।
সে ডাকে সাড়া দেবার -
এই তো শুভলগ্ন, এই তো পূন্য লগ্ন।

'সু'.....।

তরুন সাধুখাঁ

নিশেধের ব্যাকারন ছিল তখন। কি যেন নাম ছিল তাদের। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। এক কলেজে পড়তাম না। টিউশানি এক জায়গায় ছিল। জিভের ডগায় 'সু' টা এলেই শেষের দুটো অক্ষর আসে না; দেখা না তৃষ্ণা ঠিক করতে পারিনা। বোধ হয় নীলাদ্রী ওর প্রেম টেমে পরে ছিল। প্রেম মানে অনেকেই জানে না। আমি জানি কিনা বলব না। তবে আমি সিওর প্রেম মানে শুধু বাদাম খেয়ে নদীর পাড়ে ঘুরে বেড়ান নয়। অন্য কিছু হতে পারে। দুজনে এক সঙ্গে ভবিষ্যত প্ল্যানিং করা হতে পারে। ভবিষ্যতেটাকে রঙিন মোলাটে দুজনে বাল করে মুড়ে নিতে পারে। বিয়ে করে ভালোবাসার থেকে ভালোবেসে বিয়ে করাটাই বোধ হয় ভাল। কারন প্রথমটাতে ভালোবাসনো হয় আর দ্বিতীয়টাতে ভালোবাসা হয়। আসলে এদের কথা মনে পরত না। মোবাইলে আমার প্রেমিকা সুরমার নতুন বছরের ম্যাসেজটা পেয়ে 'সু' দিয়ে আরো কেটা নাম মনে করতে চেয়েও পারলাম না। এত কথা ফ্যাচফ্যাচ করে তোমাদের বলে ফেললাম। একটু সহ্য করে নাও। কিন্তু মনে করো না। যতই হোক আমি তোমাদের বন্ধু নয়। বন্ধু হলে তে অত্যাচার করতাম না।

আদ্যাশক্তি মহামায়া

ডাঃ বঙ্কিম পন্ডিত

ভারতের মুনি ঋষিরা তাদের প্রকৃত ধ্যানের গভীরতার মধ্যে যে করুনাময়ী মাতৃমূর্ত্তি অবলোকন করে ধন্য হয়েছেন তার প্রকৃত তাৎপর্য তত্ত্বমন্ডিত ও অনুপম। প্রকৃতপক্ষে দেবী মহামায়া পরমাত্মাশ্বরা পিনী আদ্যাশক্তি। দেবী দুর্গার বাহন পশুরাজ সিংহ- মহিষাসুররূপ অশুভ অসুরশক্তি তার পদতলে। অজ্ঞান অসুরশক্তিকে তিনি বধ করেছেন প্রকৃত জ্ঞানরূপী বিবেকশূলে। মায়ের দক্ষিনে দক্ষিনামূর্তিতে আবির্ভুত সর্বসিদ্ধিদাতা জ্ঞানগুরু গনপতি। গনপতির প্রশস্থি সংগীত বড়ই মধুর - ভক্ত আর ভগবানের চিরন্তন নৈকট্য ঃ

"মহামতি গনপতি পুরুষ প্রবর।
পূজনীর বরনীয় তুমি সিদ্ধেশ্বর।।
হতে পারি কিসে আমি মার মনোমত।
এই মন্ত্রে হলে সিদ্ধিকর্মে থাকি রত।।
মার কর্ম মার ধ্যান মার বলে গনি।
মায়ের কৃপায় তুমি হলে মহাধনী।।
তব কাছে মানি হার দুর্বৃত্ত সংস্কার।
হল বাধ্য ধরিবারে মুষিক আকার।।
কেহ যাহা পায় নাই তুমি তা লভিলে।
মায়ের আসন তুমি আপনি না নিলে।।

মহামায়ার বামে বিপুল বলবিক্রমশালীদের সেনাপতি কার্তিকেয়। পাশে বাগ্‌দেবী সরস্বতী - সর্বোপরি গুরুরূপী পরম শিবও চিত্রিত। এই মহাশক্তির মাঝেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তুষ্টি, শান্তি, ধৃতি, পুষ্টি, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা সমভাবে বিরাজিত। অপার করুণাময়ী মা দুর্গা - তাই তিনি বিশ্ববাসী সন্তানের, ভক্তের আকুল আহবানে ছুটে আসেন মৃন্ময়ীরূপে - আর তাই মায়ের আগমনে ধর্মপ্রান বঙ্গ বাসী মাতৃমহিমার কথা ভেবে মেতে ওঠে মাতৃআরাধনায়। যদিও বাসন্তীপূজার প্রচলনের মধ্যে এক বিশেষ রহস্য লুকিয়ে আছে। শ্রী রামচন্দ্র রাবন নিধনের জন্য অকাল বোধনের মাধ্যমে মাতৃপূজা করেছিলেন। বাসন্তীপূজা মাতৃভাবের আর শারদীয়া দুর্গাপূজা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয় কন্যাভাবে, চোখের জলে। তাই শরতের এই দুর্গাপূজা দেবীকে কন্যারূপে কল্পনা করা হয়। এ পূজা বাৎসল্য ভাবে। বাৎসল্য বড়ই মধুর ভাব। সাধকের প্রানে যখন পূর্ন ভক্তির উদয় হয় তখন আর পূজ্য পূজক, সাধ্য - সাধক ও সেব্য- সেবকের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, সবই একাত্ম হয়ে যায়। বৎসরান্তে একবার মায়ের আগমন। এই দীর্ঘকালের জ্ঞানাগ্নিতে অন্তরের কলুষ - কালিমা - অন্ধকার দূর হয়ে সাধকের উত্তোরন ঘটে সাত্ত্বিকতায়। তাইতো সাধক জগদ্ধাত্রী জগজননীকে মাতৃরূপে পূজায় তৃপ্তি পায় না। প্রান চায় মাকে কন্যারূপে, আদরে, সোহাগে, বাৎসল্যে, মধুরে একাত্মতায় একাগ্র হয়ে সেবা করতে। আদ্যাশক্তি মহামায়া অনন্তশক্তির উৎস। তার মাঝেই নিহিত রয়েছে সৃষ্টি - স্থিতি - লয় তথা সকল দেবশক্তি। তার শক্তি যেমন অচিন্ত্য অনন্ত তেমনি বিশ্বের আদি শক্তি। ভক্তি আর ভগবানের সম্পর্ক চিরকাল পরম জ্যোতিরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ভক্তের সুখেই মায়ের সুখ। মা যে ভক্ত সন্তান বৎসল্য। ভক্তকে দয়া, কৃপা ও করুনা করেই মায়ের সুখ আনন্দ ও তৃপ্তি। তাই তো মা আর কিছুই চান না। চান সন্তানের কাছ থেকে ব্যাকুলতা আর নাছোড় বান্দা ভাব। সাধকের প্রানের আকুতিতে যেমন শ্যামা হয়ে দেখা দেন তেমন শ্যাম হয়েও মধুর মুরলীদ্ধনি করেন। প্রকৃত ব্যাকুলতার মাঝেই মায়ের অবস্থান আর তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত হলো শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুলতা মা আর ভক্তের মধ্যে সেতু বন্ধনের মত এপার ওপার সমভাবে বিরাজ করে।

হে মহাশক্তি পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করে তাপদগ্ধ পৃথিবীর বুকে আর একবার সংহার মূর্তিতে দেখা দাও মা। তোমার শানিত খঙ্গাঘাতে অশিবশক্তি, তাপসী শক্তি আর অবিদ্যার, রূপিনী অমানিমার অবসান হোক মা। হে বিশ্বপালিকে যারা বিপথগামী তুমি তাদের পথের সন্ধান দাও - নির্যাতীত নিপীড়িত অশান্তি জর্জরিত সন্তানের ঘরে ঘরে শান্তি এনে দাও মা। বিস্মৃতির অন্ধকূপে আবদ্ধ মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন কর, মায়াবদ্ধ মানুষকে পামাছেদনের মন্ত্র শিখিয়ে দাও। হে কল্যানময়ী যারা তোমার ভুলে তোমার সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাতে চাইছে তাদের মনে চেতনার, ভাবের আর ভক্তির জোয়ার এনে দাও মা। হে জননী দিকে দিকে তোমার মঙ্গলসাংখ বেজে উঠুক। হে জননী, তোমার মঙ্গলশংখের অমৃতময়ী সুরে সারা বিশ্ব বিমোহিত হয়ে উঠুক। মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে বেজে উঠুক অপূর্ব সুর মুর্চ্ছনা। সেই অমৃতময়ী সুধা পান করে মানবশিশু রূপান্তবিত হোক্ দেব শিশুতে। মাতৃমহিমায় ভূলোক দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত হোক্। অনাবিল প্রশান্তিতে সারা বিশ্ব জ্যোর্তিময় হয়ে মাতৃমহিমায় জয় গানে মুখরিত হয়ে উঠুক। হে বিপদ তারিনী হে মহামায়া, হে মা দুর্গা, হে মহাচন্ডী, হে অনন্তময়ী, হে অসুরদলনী তোমার কৃপায় স্বর্গরাজ্য অসুর করকবল মুক্ত হয়ে শান্তি জহ্নবীর পুত্র মালিলে অবগাহন করে যেমন তৃপ্তি সুধাপানে ধন্য হয়েছিল, হে জগদম্বে অম্বিকে আজকের দিনে আবার তোমার অর্বিভাবের প্রয়োজন দেখা দিয়েছেমা। মানুষের হৃদয় মন্দিরে শানিত হচ্ছে শঠতা হীন তা, স্বার্থপরতা আর নির্মম তার কঠিন অস্ত্র। বিশ্বের দিকে দিকে জমে উঠেছে। হিংসা আর বিদ্বেষের কেলদাক্ত পর্বত। সমাজও রাষ্ট্রে ক্ষেত্রে বয়ে চলেছে অশান্তি আর নির্মমতার প্রবল ঝঞ্ঝা। হে বিপদতারিনী, হে জগন্মাতা মহামায়, হে মহাচন্ডী, বরাজদায়িনী, অশ্বিনাশিনী, ষোড়শী- ভূবনেশ্বরী - ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, মাতঙ্গিনী, ত্রিভূরসুন্দরী, ভৈরবী তোমার আবির্ভাবের লগ্ন সমুপশিত - মাগো কৃপাময়ী কৃপা করে, বিশ্ব ব্রহ্মান্ডকে তুমি পরিশুদ্ধ কর মা। মাতৃমহিমায় ভূলোক দ্যুলোক অভিলিঞ্চিত হোক। তোমার অপার করুনার কথা স্মরনে রেখে প্রার্থনা জানাই -

" শরনাগত দীনর্ত পরিত্রন পরায় নে।
সর্বস্যতি হরে দেবী নারায়নি
নমোহস্তুতে।"

পেটের রোগ ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ দেবাশিষ মালিক

জলের অপর নাম জীবন। জল ছাড়া কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। আবার বিস্ময়ের বিষয় হল এই জলই যখন দূষিত হয়ে যায় জীবন দায়ী জল তখন জীবন ঘাতী হয়ে দাঁড়ায়। যতগুলি পেটের রোগ আছে তার বেশির ভাগটা জল বাহিত বা জল এর জন্য দায়ী।

অম্বল ঃ প্রতি ঘরে ঘরে এই রোগটি বিদ্যমান। প্রায় সকলের মুখে শোনাযায় অম্বলে গলা জ্বালা করছে, পেটটা ফুলে আছে, ঢেকুর দিচ্ছে টক ইত্যাদি ইত্যাদি। এর প্রধান কারন অপরিমিত খাদ্যাভাস, মশলা যুক্ত ও প্রানীজ প্রোটিন বেশি পরিমানে গ্রহন।

আমরা যে খাদ্য খাই তা প্রথমে পাকস্থলিতে আসে, পাকস্থলি থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়ে খাদ্য জারিত করে। যদি কোন কারন বশত বেশি পরিমানে এই অ্যাসিড ক্ষরিত হয় তা হলে অ্যাসিডিটি দেখা যায়। আবার প্রানীজ প্রোটিন বেশি পরিমানে খেলে অম্বল বেশি করে হয়। কারন পাকস্থলি শর্করা জাতীয় খাদ্রের পরিপাক করে। যখন পোটিন বা ফ্যাট জাতীয় খাদ্য পাকস্থলিতে আসে তখন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বিক্রিয়ার মাধ্যম না পেয়ে এই রোগের সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা ঃ অম্বলের সঙ্গে জলপিপাসা থাকলে **নাক্সভমিকা,** জল পিপাসা না থাকলে **নাক্স মসকেটা,** বিকালে হলে **লাইকোপোডিয়াম,** পেটের উপরিভাগে বায়ু চাপ দিলে **কার্বভেজ,** রিচ খাবার খেয়ে হলে **পালসেটিলা,** বাসি বা পচা খাদ্য খাবার ফলে হলে **আর্সেনিক,** সমস্ত পেট ফাঁপা, মলের সঙ্গে অভুক্ত দ্রব্য উঠে এলে **চায়না,** অম্বল সহ চর্মরোগের প্রবনতা **নেট্রাম সালফ।**

আমাশয় ঃ আমাশয় একটি জীবানু ঘটিত জল বাহিত রোগ। দুই রকম জীবানুর আক্রমনে এই রোগ দেখা যায়। অ্যান্টামিবা হিস্টোলাইটিকা জীবানু থেকে অ্যামিবিক ও শিগেলা ব্যাসিলি থেকে ব্যাসিলারি আমাশয় দেখা যায়। অ্যামিবিক আমাশয় প্রচন্ড পেটে কুন্দন ও বারে বারে পায়খানার বেগ আসে। রোগ পুরাতন হলে পায়খানায় রক্ত আসতে পারে। ব্যাসলিারি আমাশয়ে কুন্দন, স্বল্প পায়খানা হয়। রোগী মাঝে মাঝে ভাল থাকে আবার রোগ দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ সাদা আমাশয়ে **মার্ক-সল,** রক্ত থাকলে **মার্ক-কর,** বেগ আসার সঙ্গে মল নিঃসরন, ভোরে বৃদ্ধি **অ্যালো,** মল, মূত্র, ঘামে প্রচন্ড দুঃর্গন্ধ **ব্যাপটিসিয়া,** নাভির কাছে যন্ত্রনা, চাপে উপশম **কলসিন্থ,** শরৎকালিন আমাশয়ে **কলচিকাম।**

ডাইরিয়া ঃ এই রোগটি একটি জল বাহিত রোগ। পাতলা পায়খানা, বমি, খিদেনা পাওয়া এবং পেটের যন্ত্রনা। শরীর থেকে জল বেরিয়ে যাওয়া শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়ে জিভ শুকিয়ে যায়। তারপর ডি-হাইড্রেশন।

চিকিৎসা ঃ প্রচুর দুর্গন্ধ যুক্ত মল **পডোফাইলাম।** হলুদ রঙের ফেনার মক মল **কলোসিন্থ,** পিচকারির মত বেগে মল নিঃসরণ **ক্রেটন বিগ,** ঠান্ডা লেগে উদরাময় **ডালকামারা,** রিচ খাবার ফলে পায়খানা **পালসেটিলা,** শোথ বা উদরীর সঙ্গে উদরিময় ও বমন **অ্যাসেটিক অ্যাসিড।**

কলেরা ঃ ভিব্রিও কলেরি নামক জীবানু থেকে এই রোগ সৃষ্টি হয়। দুর্গন্ধ যুক্ত পাতলা চাল ধোয়া জলের মত মল। আস্তে আস্তে চোখ বসে যায়। নাড়ী নিস্তেজ হয়ে পড়ে, শরীর ঠান্ডা হয়ে আসে, প্রচন্ড তৃষ্ণা থাকে। আক্রমন বেশি হলে হাত পায়ের গাঁটে খিল ধরে, স্বরভঙ্গ দেখা যায়। কপালে ঠান্ডা ঘাম দেখা যায়।

চিকিৎসা ঃ কপালে ঠান্ডা ঘাম সঙ্গে বমি, পায়খানা **ভেরেট্রাম এল্বা,** হাতে পায়ে খিল ধরা **কুপ্রাম মেট,** এতে কাজ না হলে **রিসেনাস,** রোগীর প্রচুর পরিমানে ও.আর.এস. না থাকলে জলের সঙ্গে নুন চিনি মিশিয়ে খাওয়াবেন। (ডাইরিয়ার চিকিৎসা দেখবেন)

কোষ্টবদ্ধতা ঃ কোষ্টবদ্ধতা বলতে আমরা পায়খানা কষে যাওয়াকে বুঝি। পায়খানা হয় খুব কম এবং গুটলি আকারে, অনিয়মিত পায়খানা, বেগ থাকে না। পায়খানা করতে কষ্ট হয়। রোগী সপ্তাহে তিন বা তার কমবার পায়খানা করে থাকে।

চিকিৎসা ঃ মাদকশক্তি, অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে **নাক্সভমিকা,** কঠিন কালোরঙের গোলগোল মল হলে **ওপিয়াম,** ছাগল মলের মত পায়খানা গুটলি গুটলি হলে **প্লাম্বাস মেট,** ভীষন কোঁথ না দিতে হলে মল বের হয় না **অ্যালুমিনা,** জ্বরের সঙ্গে কোষ্ট বদ্ধতা **ব্রায়োনিয়া,** মায়ের দুধ খায় যে শিশুর হলে **হাইড্রাসি।**

শেষ একটা কথা না বললেই না তাই বলে রাখি। রোগ হবার আগে সাবধানতা নিন, এতে রোগে ভোগার থেকে দূর সরে থাকা যায়। কখনই ডাক্তার বাবুর পরামর্শ ছাড়া ঔষধ খাবেন না। কারন ডাক্তারবাবু তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে রোগের ঔষধ নির্বাচন করেন।

আপনার এলাকার যেকোন ঘটনার কিংবা
অনুষ্ঠানের খবর তথ্য সহ
জেলার খবর সমীক্ষা
পত্রিকা দপ্তরে পাঠান, আপনার নামেই সেটি প্রকাশিত হবে।
(যদি না নাম গোপন রাখতে চান)

তোমরা আমার সব নাও, চক্ষু, রক্ত, অস্থি-মজ্জা, দেহ - সব নাও, শুধু পুড়িয়ে দাও অন্ধ কুসংস্কার আর ভ্রান্ত ধারনাগুলি তোমাদের মধ্যে আমার পুনঃর্জন্ম হোক।

অমরত্ব লাভ করুন মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে। অসুস্থকে অঙ্গদানে সুস্থ ও দৃষ্টিহীনকে পৃথিবীর আলো দেখান।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান

চক্ষু ও দেহদানে আপনার কি লাভ ?

আপনি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ, জীবে প্রেম মানুষের ধর্ম, অসুস্থকে অঙ্গ দানে সুস্থ ও দুজন দৃষ্টিহীন মানুষকে দৃষ্টিদান করে আপনি বিজ্ঞান মনস্কতার ও মানবিকতার পরিচয় দিয়ে অমরত্ব লাভ করবেন। পৃথিবীতে এই আন্দোলনের সূচনা ১৮২৩ সালের চিন্তা থেকে, ১৮৩২ সালে মৃত্যুর পর বিজ্ঞানের কাজ মরণোত্তর দেহদানের সাথে মনিষী জেরেমে বেনহাম-এর নাম সার্থক হয়ে আছে। লন্ডনের সংগ্রহশালায় সযত্নে রাখা তার কঙ্কাল আমাদের প্রেরনা যোগায়। আমাদের দেশে ১৯৫৬ সালে এই আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়, আর পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯০ সালে এই ব্যাপারে স্মরনীয় কারণ সুকুমার হোম চৌধুরীর মৃতদেহ আমাদের রাজ্যে প্রথম সংগঠিত মরণোত্তর দেহদান।

পৃথিবীতে যতদিন বাঁচব এই সুন্দর পৃথিবীটাকে সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করব। আর যখন মৃত্যু হবেই তখন যাতে সেই মৃতদেহ অসুস্থ মানুষের কাজে লাগে তার জন্য মৃতদেহ দান করাটাই হোক আমাদের লক্ষ্য। বর্তমানে মৃতদেহ থেকে নিয়ে ১৪টি কোষ-কলা-প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। যেমন-চোখের কর্নিয়া (Cornea), কানের পর্দা (Ear-drum), কানের হাড় (Ear-bone), বৃক্ক (Kidney), চামড়া (Skin), হাড় (Bone), রক্ত (Blood), হৃদযন্ত্রের কপাটিকা (Heart-valve), হৃদযন্ত্র (heart), ফুসফুস (Lung), যকৃৎ (Liver), অগ্নাশয় (Pancreas), ডিম্বাশয় (Ovary) ও মজ্জা (Bone-marrow)। কাজেই আসুন আমরা আর মৃতদেহ পুড়িয়ে অথবা কবর দিয়ে নষ্ট না করে বিজ্ঞান সম্মতভাবে কাজে লাগানোর উদ্যোগী হই। আর কর্নিয়া জনিত অন্ধত্ব দূর করতে একমাত্র মৃত মানুষের চোখেরই প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত রক্তের মতো কর্নিয়া তৈরীও কল-কারখানায় সম্ভব হয়নি।

আপনি এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরও আপনার প্রতিস্থাপিত অঙ্গ ও চোখ দুটি কিন্তু থেকেই যাবে এবং অসুস্থকে সুস্থ ও দৃষ্টিহীনকে পৃথিবীর আলো দেখাবে।

এলাকার মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে অমরত্ব লাভ করেছেন যাঁরা সেই সমস্ত মৃত্যুঞ্জয়ীদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং যারা আপনার ইচ্ছাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য সহযোগিতা করেছেন, আমাদের সংগ্রহ কেন্দ্রের তরফ থেকে তাঁদের পরিবার বর্গকে শ্রদ্ধা জানাই এবং সেই সাথে এলাকার সমস্ত পরিবার ও মানুষকে আবেদন জানাই যে, আপনারাও মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান করে অমরত্ব লাভ করুন।

এলাকার যে সমস্ত মানুষ কর্নিয়া জনিত কারণে দেখতে পাচ্ছেন না, তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাকে পৃথিবীর আলো, সুন্দর রূপ, রং দেখার জন্য কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করে আপনার জীবনটাই বদলে দেবার ব্যবস্থা করব।

মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান সংগ্রহ কেন্দ্র (সমূহ)

আমরা শুধু অঙ্গিকার চাই না মরণোত্তর চক্ষু ও দেহ চাই,

স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

অমরাগড়ী যুব সংঘ, অমরাগড়ী, হাওড়া।
জয়পুর সাধনা সমিতি, জয়পুর, হাওড়া।
কলবাঁশ ফ্রেন্ডস ইউনিয়ান ক্লাব, কলবাঁশ, হাওড়া।
পলাশপাই নেতাজী ব্যায়াম সমিতি, পলাশপাই, হুগলী।
হায়াৎপুর নেতাজী সংঘ, হায়াৎপুর, হুগলী।
নতীবপুর পল্লী সেবা সমিতি, নতীবপুর, হুগলী।

আমরা শুধু অঙ্গীকার চাই না চক্ষু ও দেহ চাই,
স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে যোগাযোগ করুন।

দুই দৈত্যের গল্প

অমিত কুমার রায

প্রচলিত একটি কথা আছে নানা 'মুনির নানা মত'- আজ আমি একটি প্রাচীন পুরান কাহিনীর গল্প বলব। তোমরা মেধস মুনির নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে? তাঁর কাছে সুরথ রাজা ও বৈশ্য সমাধি যে যে পুরান কাহিনী শুনেছিলেন তারই একটির সংক্ষিপ্ত বিবরন দিচ্ছি।

আমরা মহাবিশ্বের যে প্রলয়ের কথা শুনে থাকি এটি তারই রোমাঞ্চকর তথ্য।

প্রলয়ের চারিদিক অন্ধকার নেই কোনো আলোর সন্ধান। নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য, নাহি গ্রহ চরাচর। শুধু জল আর জল। সেই মহা সমুদ্রের মাঝে যোগমায়ার লীলায় অনন্তনাগের উপরে নারায়ন ঘুমোচ্ছেন যেন কোথাও কিছু হয়নি আর তার ঠিক পায়ের কাছে লক্ষীদেবী বসে নারায়নের পদসেবা করছেন। নারায়নের নাভি থেকে একগাছা তিনশো ফুট উঁচু পদ্মফুলের ডাঁটা তার ওপরে তেত্রিশ হাজার মাইল চওড়া পদ্ম। তার ওপরে দিব্বি বিষ্ণু নাম জপে চলেছেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। নতুন সৃষ্টি তো করতে হবে, চিন্তা করছেন; এমন সময় নারায়নের কানের ভেতর থেকে দু'দুটো কালটে অসুর বেরিয়ে এল - তাদের নাম দুটোকে দিয়ে ছিলো জানি না তবে নাম দুটি জব্বর। মধু ও কৈটভ। তাদের আকাল চচ্চড়ে খিদে পেটে চু মারছে, ওপর দিকে নজর যেতে দেখে লালটুকটুকে কি যেন খাবার, ওরাতো আর ব্রহ্মা চেনে না আর ব্রহ্মান্ডও চেনে না। হুস করে ওপরে উঠে হাত বাড়ালো ব্রহ্মার দিকে ব্রহ্মা থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে দৈত্যদের নাগাল এড়িয়ে নারায়নকে ফোন করলেন, নারায়নের মোবাইলের সুইচ অফ তিনি মহানিদ্রয় মগ্ন, লক্ষীকেও বলি একটু ঠেলেঠুলে তুলেদিতে পারে না বাপু! বেচারি ব্রহ্মা যোগমায়াকে এস.এম.এস. করলেন ব্যাস। কাজ হল, যোগমায়া নারায়নকে এস.এম.এস. করে জানিয়ে দিল অমনি কাজ, লক্ষী মনে হয় বুঝতে পেরেছিল এস.এম.এস. কেউ না কেউ করেছে, এমন সময় দৈত্য দুটো হা হা করে নারায়ন কেই তেড়ে এল, নারায়ন রেগে মেগে গদা দিয়ে ঘাকয়েক কষিয়ে দিতেই দৈত্যরা দাঁত বের করে লক্ষীকেই খেতে এল, চটে গিয়ে নারায়ন গুমগাম চড় কিল বসিয়ে দিলো মধু কৈটভের গালে ঘাড়ে। তারপর যুদ্ধ শুরু হল কয়েক হাজার আলোকবর্ষ ধরে। ব্রহ্মা মাঝে মাঝে বলে চলেছে ঠিক সাব্বাস নারায়ন, ব্যাটার মরুক, আমার ধ্যন চটকে গেল। যুদ্ধ করতে করতে হাঁপিয়ে গিয়ে একটু দম ফেলবার জন্যে দৈত্যরা বললে নারায়ন তুমি আমাদের কাছে বরচাও যা বর চাইবে তাই দোব। মধু কৈটভ দেখল নারায়ন চিন্তা করবে এই ফাঁকে আমরা বিশ্রাম নেব। নারায়ন বললে তা হলে আমাকে এই বর দাও তোমাদের দুজনকেই যেন এককোপে কেটে ফেলতে পারি। দৈত্যরা ভেবে বললে জলে বায়ুতে আমাদের মারলে হবে না স্থলে মারতে হবে। তখন নারায়ন দুজনকে চিচিঙে টানার মত টেনে নিয়ে নিজের উরুর ওপর ফেলে সুদর্শন চক্র দিয়ে ঘ্যাচ করে ধড় থেকে দু'দুটো মুন্ডপাত করলেন। ব্যাস তারপর আর কি! তাদের মেদ নামের হাড় দিয়ে আমাদেরই এই মেদিনী তৈরী হল আর এখনো সেই মেদিনীতে অসূয়া দানবের বাড়বাড়ন্ত হয়েই চলেছে তবে এই গল্প শুনে তোমাদের ভুললে চলবে না সূর্যর অংশ খসে কোটি কোটি বছর ধরে ঠান্ডা হয়ে এই ধরিত্রীর সৃষ্টি হয়েছিল।

অমরাগড়ী অঞ্চল স্পোর্টস এ্যাসোসিয়েশন

(রেজিঃ নং - এস / ওয়ান এল / ৫৪২৯২)

চকজনার্দ্দন, জয়পুর, হাওড়া

প্রতিবেদন

পথ চলতে চলতে আমরা ৪র্থ বছর শেষ করে প্রায় ৫ম বর্ষে পা দিতে চলেছে। দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা যে পথচলা শুরু করেছিলাম তার কতটা পালন করতে পেরেছি তা অনুমান যোগ্য। পথ চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়েছি বটে, কিন্তু কিছু কর্মকান্ড ও করেছি তার মধ্যে। আমাদের **'মহিলা বিকাশ যোজনা'** তার উদাহরণ বহন করে। ছোটদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে আমাদের **'যোগব্যায়াম প্রশিক্ষন শিবির'** শুরু করতে চলেছি আগামী ২রা নভেম্বর রবিবার। যেখানে অতি সামান্ন খরচে ৪ বছর বয়সের পর থেকে ছেলেমেয়েদের যোগ ব্যায়াম শেখানো হবে। আগামী দিনের জন্য আরো একগুচ্ছো পরিকল্পনা আমরা করে চলেছি। প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে আমাদের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুঃখের বিষয় গত বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারনে আমরা সেই অনুষ্ঠান করতে পারিনি। আগামী বছরের যথারীতি সংগঠনের ৫ম বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে যথাক্রমে ১৮ ও ২৫ জানুঃ দু-দিন ধরে। গত বছরে যে সমস্থ ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহন করতে চেয়েও আশাভঙ্গ হয়েছে তারা সেই ভাবে ৫ম বার্ষিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করতে পারবে। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আশায় পথ চলা শুরু করে আমরাও তাই করছি। যেহেতু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের গন্তব্যের সীমা থাকেনা, তাই পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত হলেও আমাদের এই গর্বেই এগিয়ে যেতে হবে। আগাম শারদীয়া ও ঈদের শুভেচ্ছান্তে

সুজিৎ সাঁতরা
(সম্পাদক)

নতুন থিমের ঐতিহ্য ধরে রেখেছে হাওড়ার পূজো

শ্যামসুন্দর বসু

হাওড়া শহরকে সকলে যতই অবহেলা করুক না কেন, হাওড়া শহর কোন দিনই কোন ব্যাপারে পিছিয়ে থাকে না। তাই আশ্বিনের মহাপূজায় থিম অর্থাৎ ভাবনা নিয়েও হাওড়া শহর থেকে মাতোয়ারা হয়ে। তাই বনেদী বাড়ী ও বারোয়ারী পূজার সাবেকী ঐতিহ্যের মঙ্গে সঙ্গে শহরের বিভিন্ন মন্ডপে নানা ধরনের থিমের প্রতিমা ও পরিবেশ তুলে ধরেছে।

পূজোর উদ্যোক্তারা দেশবিদেশের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি ও পরিবেশ বিভিন্ন মন্ডপে মন্ডপে তুলে ধরেছেন। আবার প্রাচীন লোকায়িত উৎসবের রঙে রাঙানো হয়েছে বিভিন্ন পূজামন্ডপ।

ব্যাতাই তলার কল্যান পল্লী সার্বজনীন দুর্গাৎসব সুবর্ন জয়ন্তী বর্ষে নতুন ভাবনার সৃষ্টিশীল প্রতিমা মন্ডপ ও পারিপার্শ্বিক অলঙ্করন 'পাট পাটায় আছে শিল্পের প্রান, ওই শোনা যায় ভাদু টুসুর গান' অভিনবত্বের দাবী রাখে।

রামরাজাতলা ভাই ভাই সংঘ গ্রাম বাংলার পৌষ পাবওন তুলে ধরেছে তাদের মন্ডপে।

আদিবাসীর আদলে মা দুর্গা মন্দিরের দুপাশে খড়ের চালের নীচে গ্রাম্য পরিবেশে লোকসংস্কৃতি শিল্পকলা ও অন্যান্য দেবতার ছবি এঁকে মন্ডপ সাজিয়েছে ইছাপুর মিতালী সংঘ।

আরন্যক সাঁওতালবাসীদের ঘরবাড়ি, বনজঙ্গল, পাহাড়ী ঝরনা ও উৎসব এবং সাঁওতালবাসী আদলে প্রতিমা গড়ে আকর্ষনীয় করে তুলেছে উত্তর বালিটিকুরীর খালধারপাড়ায় সেবা সমিতির মন্ডপ।

মৎস্য জীবীদের গ্রাম, গ্রামবাসীদের জীবন খাতা, ঘরবাড়ঈর জীবন্ত ছবি তুলে ধরা হয়েছে ইছাপুরের কামারডাঙ্গা শীতলা বারোয়ারীর পূজামন্ডপ।

ফল ও বীজ প্রানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যা প্রকৃতির অবোধ নিয়মে নিত্য বন্ধনে থাকার সার্থক প্রয়োগ তুলে ধরেছে মধ্যহাওড়ার বাগ্‌বাদিনী ব্যায়াম সমিতির ৭১তম পূজা ভাবনায়।

মাটির পুতুলের মাধ্যমে রামায়নের নির্বাচিত অংশ তুলে ধরেছে হাওড়া অকালবোধন সংঘ ৭৩ বর্ষের দুর্গোৎসব মন্ডপে।

অজন্তা ইলোরার গুহা উঠে এসেছে মধ্য হাওড়া বেলিলিয়াস লেনে জাতীয় সেবাদলের পূজামন্ডপে।

পঞ্চাশ ফুট উচ্চতার পাহাড়ের উপর কামাক্ষার মন্দরে ঘুসুড়ীর তালতলা মন্দিরে।

ইছাপুর শিবাজী সংঘ তৈরী করেছে কোচবিহারের রাজবাড়ী।

ডুমুরজলা স্বামীজী স্পোটিং ক্লাব তৈরী করেছে চামুন্ডা কালীর মন্দির।

মিশরের পিরামিড, মমি তুলে ধরেছে বালিটিকুরির সদানন্দ স্মৃতি মন্দির।

সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল এর চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সরস্বকী সংঘের মন্ডপে।

মন্ডপে সাধুদের তন্ত্রসাধনার ছবি ফুটিয়ে তুলেছে চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দির।

অক্ষরধাম মন্দির তৈরী করেছে কদমতলার সুবল স্মৃতি সংঘ।

দাসনগর যুব সংঘর পূজা মন্ডপ রূপ নিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের বসত বাটি। আর আছে সঘের ক্রীড়া নৈপুন্যের পরিচিতি প্রদর্শনী।

রামকৃষ্ণ এথেলিটিক ক্লাবের দুর্গামন্ডপ রূপ নিয়েছে বিজয়গড় মন্দিরের।

শিবপুর নীলরতন মুখার্জী রোডে সম্মিলিত নাগরিক বৃন্দের পূজা ২৮ বছরে পড়েছে। এবারের থিম হোগলারনে দশভূজা।

নগরায়নের বিরুদ্ধে সহদের অভিযান 'পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে মন্ডপ। হাওড়া ৬এর পল্লী যোগীন মুখার্জী লেনে ঝারগ্রামের কনকদুর্গা মন্দিরের অনুরায়নে মন্ডপের নির্দেশনায় দীব্যেন্দু পাল আছেন বলে জানালেন সংঘ সদস্য জ্যোতির্ময় পাত্র।

থিমের উপর সাধারণ মানুষের বিশেষ আকর্ষন থাকলেও বনেদী প্রথার পূজাগুলির উপর মানুষের টান একটুও কমেনি। তার মধ্যে কয়েকটি পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮২ - ৮৩ সালে রাজা রামব্রহ্ম বারাকপুর - মনিরাশপুর থেকে ১১টি গ্রামের জমিদারী নিয়ে শিবপুরে আসেন ও দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। ৩২৪ বছরের পুরাতন পূজামন্ডপ রায়চৌধুরীদের সাজের আটচালা নামে পরিচিত।

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের বাড়ীতে অভয়া মুর্তি পুজা বহু বছর ধরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে মোষবলি দেওয়া হয়।

ঈশানচন্দ বসু প্রতিষ্ঠিত দুর্গা পূজাটি ১৮৫১ সাল হতে রামকৃষ্ণপুরের বসু ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্বে এই পূজাটি তাঁর আদিবাসস্থান সিংটি গ্রামে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে পূজাটির বয়স ১৮৮ বছর।

পোদড়া সরকার বাড়ীতে ২০০ বছরের প্রাচীন হরগৌরী মুর্তি পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বালীর নিশ্চিন্দায় প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীর পূজা ১৫৮ বছরে পড়েছে। তাঁদের বাড়ীর দুর্গার সিংয়ের রঙ সাদা আর বাড়ী লোকেরাই পুরোহিতের কাজ করেন।

কালী কুন্ডু লেনে কাত্যায়নী বাড়ীর পূজা ও কালী ব্যানার্জী পরিবারের পূজা বহু দিনের।

বালির চৈতল পাড়ার চারশ বচরের পুরাতন বুড়িমার পূজো উল্লেখযোগ্য। বুড়িমার পূজো শুরু করেন পন্ডিত রামগোবিন্দ ১৯২২ সালে, এটি এখন সার্বজনীন পূজার রূপ নিয়েছে।

পূজো মানেই আনন্দ। তাই পোদড়া পাকুড়তলা মন্দির

সার্বজনীন কমিটি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের উদ্যোগে আয়োজিত মাতৃসাধনার আয়োজন করেছে। পূজোটি এবছর ২য় বছরে পদার্পন করেছে।

মধ্য হাওড়া পঞ্চাননতলার চিরচরিত শিল্পমাধুর্য্য সমন্বিত অন্নপূর্না ব্যায়াম সমিতি ও অন্নপূর্না বারোয়ারী দুর্গাপূজা থিমের যুগেও আকর্ষনীয়

ইছাপুর মার্কেট স্কোয়ারে প্রবীন আবাসিকবৃন্দ পরিচালিত দুর্গাপূজাটি সাদামাটি মন্ডপে অনুষ্ঠিত হলেও ভাবগম্ভীর পরিবেশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে।

অমরাগড়ী ও ঝিখিরা গ্রামপঞ্চায়েতের দূর্গা পূজা

নানা লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি শারদীয় দুর্গোৎসব এলাকায় কয়েকশত বৎসর পূর্ব থেকেই বাৎসরিক আনন্দ ও মিলনোৎসবে পরিনত হয়েছে। ব্যায় বহুল এই পূজা মূলতঃ বিত্তশালী পরিবারের উৎসবে সামিল হয়ে আসছে। কিন্তু বর্তমানে এই সব পুজা বিত্তশালি পরিবার ছাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বারোয়ারী পুজা বা সার্ব্বজনী পুজা নাম নিয়ে।

পনের শত খ্রীষ্টাব্দে শেষ ভাগে এলাকার সর্বপ্রাচীন 'দূর্গা' পূজার প্রচলন করেন দুর্বার চন্দ্র। তিনি ঝিখিরার মধ্যপাড়ায় যেখানে চন্ডীদেবীর মূর্তি করেন তারই অদূরে কঠোর তপস্যায় ব্রতী হয়ে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সেই স্থানটি সিদ্ধপীঠ নামে পরিচিত। এই সিদ্ধপীঠের পাশে দূর্গামন্ডপ নির্মান করে দূর্গাপূজা প্রচলন করেন। আনুমানিক সময় হোসেন শাহর পুত্র নসরৎ শহুর রাজত্ব কাল। দুর্বার চন্দ্রর বংশ ধরগন 'মোদ্‌গোল্য গোষ্টীর পূজা' নামে খ্যাত ঐ পূজা এখনও চালিয়ে আসছেন।

অমরাগড়ী রায় পরিবারের পূজা (প্রায় ৩০৮ বছরের পূজা)

অমরাগড়ী গ্রামপঞ্চায়েতের অমরাগড়ী গ্রামের একমাত্র দূর্গাপূজা ১৭৯৯ খ্রীঃ শুরু করেন জমিদার রামচরন রায়। রায় বাড়ির পূজাই গ্রামের একমাত্র পূজা হওয়ায় গ্রামের সকল মানুষের আনন্দ উপভোগের একটাই স্থান। এখানে পুরানো দিনের নিয়ম মেনে প্রতিপদ থেকে চন্ডিপাঠ শুরু হয় তারপর চলে ষষ্টিতে অধিবাস ও বোধন, অষ্টমীতে সন্ধিপূজা হয়ে দশমীতে বিসর্জন। এই বাড়ির বিসর্জন হয় দুপার ১২টার সময় কারন হিসাবে জানা যায় অতিতে বাড়ির কোন একজন মারা যান ঐ দিন সেই থেকেই এই নিয়মে চলছে। আর প্রতিমা বিসর্জনের পর ঐ বাড়িতে উনুন জ্বালানো হয়। পূজার মন্দিরটি পাকা এবং মন্দিরের সামনে ছিল আটচালা বর্তমানে অবশ্যই ঐ আটচালা আর নেই। জমিদার আমলে পূজার কদিন পূজার বিশাল আয়োজন ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত কিন্তু বর্তমানে সেই সব আর নেই। আছে শুধু পূজা। আর এখানকার পূজা চলে প্রায় দেবোত্তর সম্প্রতির উপর।

কাঁড়ার বাড়ির পূজা

বড় কাঁড়ার বাড়ির পূজা কবে থেকে শুরু হয়েছে ঠিক বলতে পারেনি তবে এখানকার পূজা হচ্ছে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ বছরের মত। এখানকার ঠাকুর একচালের তৈরি হয়, পূজার বিশেষ কোন বৈশিষ্ঠ্য না থাকলেও আগের মত সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পাঁঠাবলি হয়ে আসছে।

ছোট কাঁড়ার বাড়ির পূজা শুরু হয় বড় কাঁড়ার বাড়ির পূজার পরে। একচালার দেবী মূর্তির পূজা হচ্ছে দেবত্তর সম্পতি ও বর্তমান প্রজন্মের দেওয়া অর্থে। আগে এখানে ছাগ বলি হলেও বর্তমানে নিরামিষ বলি হচ্ছে।

ঝিখিরা চক্রবর্ত্তী বাড়ির পূজা (প্রায় ২০০ বছরের)

ঝিখিরা গ্রামের চক্রবর্ত্তী বাড়ির পূজা শুরু করেন রামব্রহ্ম চক্রবর্ত্তী। প্রতিপদ থেকে চন্ডিপাঠ শুরু হয়ে পাঁজি মতে দশমী পর্যন্ত্য পূজা হয়ে আসছে জাঁকজমক ভাবে তবে বর্তমানে আর্থিক কারনে পূজার সেই জৌলুষ কমে গিয়ে কোন রকমে পূজা সম্পন্ন করছেন বাড়ির বর্তমান কর্তারা।

ঝিখিরা ভট্টাচার্য্য বাড়ির দূর্গাপূজা (২০০ বছরের প্রাচীন)

কবে থেকে চালু হয়েছিল ঠিক না জানা গেলেও আনুমানিক ঝিখিরা ভট্টাচার্য্য বাড়ির দূর্গাপূজা শুরু করেন রামশম্ভু ভট্টাচার্য্য মহাশয় । তারপর থেকে প্রতি বছরই নিয়ম করে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এমনকি ১৯৭৮সালে ভয়াবহ বন্যাতেও পূজা হয়েছে। ভট্টাচার্য্য বাটির দূর্গার বিশেষ বৈশিষ্ট দূর্গার ডান দিকে কার্ত্তিক ও লক্ষী এবং বামদিকে সরস্বতী ও গনেশের অবস্থান। দেবীর এইরূপ পূজার বৈশিষ্ট দেখা যায় বাংলাদেশে। এদের মতে পদ্ধতিটির নাম 'জ্ঞানসিদ্ধ'। জ্ঞান বা সরস্বতীর নীচে সিদ্ধি বা গনেশের স্থান। এখানকার পূজায় নবমীর দিন পশু বলি হত বর্তমানে নিরামিষ বলি হয়।

রাউতড়া ঘোষ বাড়ির দূর্গাপূজা (ব্রাহ্মন ছাড়া পৌতহিত্য কাশ্যপ বংশের প্রায় ৩০০ বছরের পূজা)

রাউতড়া গ্রামের ঘোষ পরিবার জাতিতে কায়স্ত হলেও প্রায় ৩০০ বছর আগে বর্ধমান রাজার দেওয়ান নিধিরাম ঘোষ পূজা শুরু করেন নিজেই পৌরহিত্য করে। তখন পৌরহিত্য করার অধিকার ছিল একমাত্র ব্রাহ্মনদের সেই অবস্থায় একজন কায়স্থ নিজেই পূজা করেছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। সেই কারনে এই বাড়ির পূজায় শালগ্রাম

ভারতীয় জীবন
বীমা নিগম
আপনার এলাকার
একমাত্র
বিশ্বস্ত এজেন্ট ঃ
উত্তম চক্রবর্ত্তী
প্রযত্নে – নারায়ন চক্রবর্ত্তী
কাঁকরোল, জয়পুর, হাওড়া

অমরাগড়ী ও ঝিখিরা গ্রামপঞ্চায়েতের দূর্গা পূজা

শিলা (নারায়ন) থাকে না এবং চন্ডীপাঠ হয় না। তবে বর্তমানে ব্রাহ্মন পুরোহত নিযুক্ত হয়েছে বটে কিন্তু এখনও নিজেরাই দেবীর ঘট স্নান করিয়ে এনে মন্ডপ পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এঁদের প্রতিমার চালচিত্রে থাকে কেবলমাত্র চামুন্ডামূর্তি। লক্ষী সরস্বতীর অবস্থান কার্ত্তিক গনেশের নীচে। বর্তমানে পূজাটি চলছে বেশির ভাগটা দেবত্তর পুষ্করনি থেকে আয় ও বর্তমান ঘোষ পরিবারের সদস্য থেকে দেওয়া অর্থে।

নারীটের দুর্গাপূজা (প্রায় ৪০০ বছরের পূজা)

ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে দীর্ঘদিন ধরে চারটি প্রতিমা চালু আছে। বড়বাড়ী, মেজবাড়ী, সেজবাড়ী, ছোটবাড়ী বলে পরিচিত আছে। দেখলাম কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের প্রতিমূর্তি। চারটে আলাদা আলাদা আটচালা। বিভিন্ন দিনে প্রতিমার সামনে বলি দেওয়া হয়। মহেষ ভট্টাচার্য্য (ন্যায়রত্ন) মহাপন্ডিত ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ছিল। তিলি, বালি, বৌনিত, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ভিজিটিং প্রফেসার হিসাবে পাঠদানে নিযুক্ত ছিলেন।

আলিজ সন বুক
প্যালেস এন্ড স্টেশনারী
পোঃ সেখ মেহবুব
বিভিন্ন বই, স্টেশনারী ও মোবাইলের
কানেকশান দেওয়া হয়
বিঃদ্রঃ কম্পিউটারের সাহায্যে
মোবাইল ফোনে গান লোডিং করা
হয়।
অমরাগড়ী (মেনকা স্কুলের পাশে), জয়পুর, হাওড়া।
ফোন ঃ ৯৯৩২৪১৩৮৯৭

Mobile : 99319 27986
Jai Mata Di
JOYITA
ENTERPRISE
Proprietor : PINTU PATRA
GOVT. LICENCE ELECTRICAL
CONTRACTOR
Electrical & Mechanical Generator D.
Instalment, Industries, Interior, Building,
Wiring Etc.
SEHAGORI, JOYPUR (AMTA), HOWRAH

গ্রামের পুজো

রূপচাঁদ রায়

শৈশব ও কৈশোরে গ্রামের জীবনে সবচেয়ে উন্মাদনা থাকত দুর্গাপুজোকে ঘিরে। আসছে, আসছে করে পুজো যত কাছে এগিয়ে আসত, উত্তেজনার পারদ ততই চড়চড় করে উপরে উঠত। বর্ষা বিধৌত গ্রামের প্রকৃতি নবরূপে সাজত। উপরের দিগন্ত বিস্তৃত নির্মল নীল আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মত সোনালি মেঘ, নীচে গাঢ় সবুজ ধান খেতের গায়ে সাদা কাশফুল গুলো হাওয়ায় দোল খাওয়া, বৃষ্টিতে ধুয়ে গাছপালাগুলোর গাঢ় সবুজ ঢেকে যাওয়া। যেন প্রকৃতিতে নতুন করে ঘুম ভঙতো। কে যেন নবসাজে সজ্জিত করছে গ্রামকে। এই এক মনোরম পরিবেশে গ্রাম মেতে ওঠে মায়ের আগমনীতে।

ঠাকুরের খড় বাঁধা শুরু হওয়া থেকে আমাদের মন্ডপে যাতায়াত শুরু হয়ে যেত। বাজারে যে পুজো হয় তা ন-আনী গোষ্ঠীর। তার মধ্যে আমরাও পড়ি। পায়ে হেঁটে আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। সারা গ্রামে সর্বসাকুল্যে সাত আটটা পুজো হয়। আমাদের বাজারের পুজোটা প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের পুরানো। আগে ছিল জমিদারদের, এখন তা বারোয়ারী। সবগুলোই একচালের প্রতিমা। পুজো উপলক্ষে শিশু কিশোরদের উন্মাদনা সর্বজনবিদিত। মহালয়ার ভোরে শিউলি ফুল কুড়ানো, তারপর খেলার মধ্য দিয়ে পড়াশুনা শিকেয় উঠত এবং তার রেশ চলত লক্ষী পুজো পর্যন্ত। কারণ লক্ষী পুজোর জাঁকজমক আমাদের গ্রামে বেশি। দুর্গাপুজো উপলক্ষে শহরের শিশু-কিশোররা তাদের পরিবার পরিজন এবং আত্বীয়স্বজনদের কাছ থেকে অনেক জামাকাপড় পেয়ে থাকে। গ্রামের অবস্থাপন্ন বাড়ির ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা খাটে। কিন্তু কৃষি জমিতে খাটা দিন মজুর অথবা শহরে কলকারখানায় কাজ করা কোন শ্রমিক তাদের শিশু পুত্রকন্যার জন্য কোনো প্রকারে বছরে একবারই মাত্র নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে সমর্থ হয়, যা অত্যন্ত সাধারণ মানের। তাই পেয়ে আত্মহারা হয়ে যেত কোনো দরিদ্র সন্তান। গ্রামে যারা শৈশব অতিবাহিত করেছে একমাত্র তারাই এই মধুর স্মৃতির দাবিদার। সেই শৈশবেও সমাজের আর্থিক বৈষম্য মনকে নাড়া দিয়েছিল। কোনো বন্ধুর বাড়িতে লক্ষ্য করতাম মহাষ্ঠমীর দিন খাওয়ার কি বিপুল আয়োজন, আবার কোনো বন্ধুর বাড়িতে লক্ষ্য করতাম কোনো রকমে তেলের পরোটা। মহানবমীর দিন যারা শুধু দূর থেকে মাংস কাটা লক্ষ্য করেছে, খাওয়ার সময় পাতে একটুকরো হাড়ও পায়নি। মার-খাওয়ার ভয়ে বাবার কাছে আবদার পর্যন্ত্য করতে পারেনি। শুধু মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছে। ১৩৮৫ সাল, তখন আমি কিশোর। দুর্গোপূজোর আর কয়েকদিন মাত্র দেরি। সাতদিনের একটানা প্রবল বর্ষনে এবং ডি.ভি.সি.'র ছাড়া জলে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলা ভেসে গেল। বাদ গেল না আমাদের গ্রামও। ঠাকুরের শুধু রঙ হতেই বাকি ছিল। প্রবল জলের স্রোতে মন্ডপে নির্মিত দেবীমূর্তি মন্ডপেই বিসর্জিত হল। সে দুঃখ আজও গভীর ভাবে মনে রেখাপাত করে। যে বিশ্বদার সাথে আগের দিন রাত্রে বাঁধ দেখতে গিয়েছিলাম, পরের দিন তারই মৃতদেহে আমাকে সেন্ট ছড়াতে হয়েছিল। বন্যার্তদের উদ্ধারে তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মাটির তৈরী বাড়ীগুলো সব মাটিতে মিশে গিয়েছিল। সেই মাটির পুরু দেওয়াল দেয়া বাড়ী, খড়ের ছাউনি, উঠানের মাঝে হরি মন্দির এখন আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

"সমাজের প্রতি জন্মান্ধের করুন আবেদন"

কথা ঃ আবদুল গফুর খাঁ

সুর - ভাটিয়ালী

গৌর চন্দ্রিকা

জন্ম থেকে অন্ধ একজন, বলছে লোক - সমাজে,
পৃথিবীতে এসে আমি, লাগলাম না কারও কাজে।
আঁধারে পথ চলতে যে, হোঁচট শুধু খেয়ে মরি,
জীবন আমার আঁধারে ভরা - বলো আমি কী করি।
পিতা-মাতার ছবি কেমন, দেখতে তো পেলাম না,
দুনিয়ার রঙ রূপ দেখা - ললাটে মোর হ'লনা।
চোখ তুলে চোখ দেওয়া যায়, শোনা যায় কানেতে,
তাইতো জানাই কাতর মনে - সমাজের কাছেতে।।

গান

১। বন্ধু হে ..... ও বন্ধু —
আমি জনম দুঃখী — দৃষ্টিহীন একজন।
আসেনা নজরে আমার, সুন্দর ভুবন।। বন্ধুহে - আমি —

২। বন্ধু হে ..... ও বন্ধু —
আঁধার থেকে এলাম যখন, এ ভুবনে তে
আঁধারই আঁধার শুধু - আমার নজরেতে,
আমার জীবন আমার, বিনা মনি - রতন।। বন্ধু হে- আমি ——

৩। বন্ধু হে ..... ও বন্ধু হে —
মানুষের মানুষের জন্য এ লোক সমাজে,
মিছে কথা নয় মোটেই, নয়তো কভু বাজে,
তাইতো ডাকি এগিয়ে এসো - কে আছো আপন। বন্ধু হে-আমি

৪। বন্ধু ..... ও বন্ধু হে ———
বন্ধ হবে কল-কব্জা, ছেড়ে গেলে শ্বাস
মরনে দান করো বন্ধু, করি আমি আশ,
দেখতে পাবো তোমার চোখে - সুন্দর ভুবন।। বন্ধু হে —আমি